শ্রীইন্দিরা দেবী

২৭শে নভেম্বর ১৯৩৭

জাপানে-পারস্যে

জাপানে-পারস্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

প্রকাশ-পরিচয়

জাপানে-পারস্যে

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৪৩
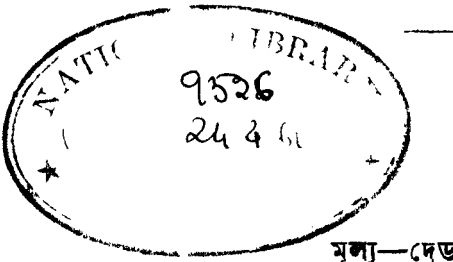
মূল্য—দেড় টাকা

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

এই গ্রন্থের "জাপানে" অংশটি পূর্ব্বে "জাপান-যাত্রী" নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল। ১৩২৬ সালের শ্রাবণে উহার প্রথম সংস্করণ এবং ১৩৩৪ সালের চৈত্রে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

"পারস্যে" অংশ সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত (পারস্যযাত্রা—প্রবাসী ১৩৩৯ আষাঢ়, পারস্য-ভ্রমণ—বিচিত্রা ১৩৩৯ শ্রাবণ হইতে ১৩৪০ বৈশাখ)। এবারে প্রথম ইহাকে গ্রন্থে নিবদ্ধ করা গেল। ইতি

শ্রাবণ, ১৩৪৩

প্রকাশক

জাপানে

জাপানে-পারস্যে

জাপানে

১

বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চল্‌তে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে ব'সে থাক্‌তে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা যাত্রা করবার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে, তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে ব'সে আছে, তখন বিদায়ের আয়োজনটা এই জন্যেই কষ্টকর; কেননা, থাকবার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুস্কিলের জায়গা,—সেখানে তাকে দুই উল্টো দিক সামলাতে হয়,—সে একরমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চল্‌ল না। অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল,—বাড়ি গেল স'রে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায় মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে,—সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা-কিছুকে সব চেয়ে নির্দ্দিষ্ট ক'রে পাওয়া গেছে, তাকে অনির্দ্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ ক'রে যাওয়া। তা'র বদলে হাতে হাতে আর একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাটাই মনের মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হচ্চে অনির্দ্দিষ্টকে ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্টের ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে চল্‌তে থাকা। অপরিচয়কে ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের কোঠার মধ্যে ভুক্ত ক'রে নিতে থাকা। সেই জন্যে যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে, চলাটাই হচ্চে তার ওষুধ। কিন্তু যাত্রা কর্‌লুম অথচ চললুম না—এটা সহ্য করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হচ্চে বন্ধনদশার দ্বিগুণ-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে ব'লেই তার কাম্‌রার সঙ্কীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাকনাটার নিচে আবার গোরের ঢাকনার মতো।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার জাহাজে চড়েছি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলামেশায় ভালো-মানুষিতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মতো। মনে হয় এঁকে অনুরোধ ক'রে যা-খুসি-তাই করা যেতে পারে,—কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নাই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ বন্ধু ডেকের উপরে তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ঘাড় নড়ল, সে ঘটে উঠ্‌ল না। সকালে ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় তিনি যে-টেবিলে বসেছিলেন, সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাপ্তেন

বললেন, এবেলাকার মতো বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হোলো না। বেশ বোঝা যাচ্চে, অতি অল্পমাত্রও ঢিলেঢালা কিছু হোতে পারবে না।

রাত্রে বাহিরে শোওয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মতো শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করচে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই। জাহাজের আলোগুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করেছে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখ্‌তে দিচ্চে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে, আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর একথাই মনে হয় যে দিনের বেলাটা মর্ত্ত্যলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে চায়, এই জন্যে এত বড়ো একটা আলো জ্বালতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এই জন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রিকেও অধিকার করতে চায়, তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়,—দেবতাকেও ক্লিষ্ট ক'রে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি জ্বেলে রাত জেগে এগ্‌জামিন পাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তখন থেকে সূর্য্যের আলোয় সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে লেগেছি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেছে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিম্‌নিগুলো

ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরের কালীকে দ্যুলোকে বিস্তার করছে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়,—কেননা দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালী মাখালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো ক'রে দেয়, তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম ক'রে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত করতে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখতে পেলুম। তাই মানুষের ক্লান্তির উপর সুরলোকের শান্তির আশীর্ব্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বলতে চাচ্চে আমিও দেবতার মতো, আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা—এইজন্যে সে চারিদিকের শান্তি নষ্ট করছে। এইজন্যে অন্ধকারকেও সে অশুচি ক'রে তুলছে।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্ম্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো,—তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো,—তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখ্‌লুম। মনে হোলো, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন ক'রে রয়েছেন।

এম্‌নি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাস্‌ছে, মানুষের আবর্জ্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারছে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখ্‌লুম তখন মনে হোলো একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন—আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্ রুদ্র রক্ষা করবেন?

২

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিছে বায়ু ভেসে চলি রঙ্গে।

কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি ও সেই বিশেষ দৃষ্টির বিশেষ রস আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েছে—বসেও আছি, চল্‌ছিও। সেই জন্যে চলার কাজ হচ্চে, অথচ চলার কাজে মনকে লাগাতে হচ্চে না। তাই মন, যা সাম্‌নে দেখ্‌ছে তাকে পূর্ণ ক'রে দেখ্‌ছে। জল স্থল আকাশের সমস্তকে এক ক'রে মিলিয়ে দেখ্‌তে পাচ্চে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হচ্চে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না। না দেখ্‌তে পেলেও চল্‌ত, কোনো অসুবিধে হোত না, পথ ভুল্‌তুম না, গর্ত্তয় পড়তুম না। এই জন্যে ভেসে চলার দেখাটা হচ্চে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা, —দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য— এই জন্যেই এই দেখাটা এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব কর্‌তে বাধ্য, কিন্তু নিজের সম্বন্ধেও দায়ে-পড়া কাজে তার প্রীতি নেই। যখন চলাটাকেই লক্ষ্য ক'রে পায়চারি করি, তখন সেটা বেশ; কিন্তু যখন কোথাও পৌঁছবার দিকে লক্ষ্য ক'রে চল্‌তে হয়, তখন সেই চলার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিতেই মানুষের সম্পদ প্রকাশ পায়। ধন জিনিষটার মানেই এই—তাতে মানুষের প্রয়োজন কমায় না কিন্তু নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বাধ্যতা কমিয়ে দেয়। খাওয়া পরা, দেওয়া নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার বাইরে যেখানে তার

উদ্বৃত্ত সেইখানেই মানুষ মুক্ত, সেইখানেই সে বিশুদ্ধ নিজের পরিচয় পায়। সেই জন্যেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারী জিনিষকেও মানুষ সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চায়—কারণ, ঘটিবাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্য্যে মানুষের নিজেরই রুচির নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটিবাটির উপযোগিতা বল্‌ছে মানুষের দায় আছে, ঘটিবাটির সৌন্দর্য্য বল্‌ছে মানুষের আত্মা আছে।

আমার না হোলেও চল্‌ত, কেবল আমি ইচ্ছা ক'রে কর্‌ছি এই যে মুক্ত কর্ত্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বস্রষ্টার এবং বিশ্বরাজ্যেশ্বরের,—সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর সাড়ী প'রে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে, আমি তাকে দেখছি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটি যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ করত, তাহোলে সেইটেই হোত সাহিত্য, সেইটেই হোত আর্ট। খামকা বিরক্ত হয়ে এমন কথা কেউ বল্‌তে পারে "তুমি দেখ্‌ছ তাতে আমার গরজ কী? তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও ঘুচবে না, তাতে আমার ফসল-ক্ষেতে বেশি ক'রে ফসল ধর্‌বার উপায় হবে না।" ঠিক কথা আমি যে দেখছি এতে তোমার কোনো গরজ নেই। অথচ আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা, এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও—তাহোলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না।

আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, আজ এতক্ষণ ধ'রে তুমি যে লেখাটা লিখ্‌ছ, ওটাকে কী বল্‌বে? সাহিত্য, না তত্ত্বালোচনা।

নাই বললুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে-ব্যক্তি আলোচনা করে, সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা

উপলক্ষ্য। এই যে শাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নিচে শ্যামল-ঐশ্বর্য্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেছে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্চে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হোত, তাহোলে এই আমিকে স'রে দাঁড়াতে হোত। কিন্তু এক-আমির পক্ষে আর-এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এই জন্য সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সেই আমির সন্ধান করি।

তেমনি ক'রেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেছে, সেও সেই দ্রষ্টা-আমি। সেখানে যা বলছে সেটা উপলক্ষ্য, যে বলছে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেছি, আমার অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি। এই ধারা কোনো বিশেষ কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে বিধৃত নয়। এই ধারা প্রধানত লজিকের দ্বারাও গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেইজন্যে আমি কেয়ারমাত্র করিনে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্ষ্যমান রচনাটিকে লোক পাকা কথা ব'লে গ্রহণ করবে কি না। বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে "আমি দেখছি" এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্চে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক ক'রে বলতে পারি তাহোলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুসি হয়ে উঠবে।

উপনিষদে লিখছে, এক-ডালে দুই পাখী আছে, তার মধ্যে এক পাখী খায়, আর এক পাখী দেখে। যে-পাখী দেখছে তারি আনন্দ বড়ো আনন্দ; কেননা, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখী আছে। এক পাখীর প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখীর প্রয়োজন নেই। এক পাখী ভোগ করে আর-এক পাখী দেখে।

যে-পাখী ভোগ করে সে নির্ম্মাণ করে, যে-পাখী দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্ম্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্চে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা,—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্চে নিজেকে সর্জ্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এই জন্যে ভোগী পাখী যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ কর্‌ছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখীর উপকরণ হচ্চে আমি পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্ত্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো রহস্য, দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্চে না,—হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। যা-কিছু ঘট্‌ছে এবং যা-কিছু ঘট্‌তে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখ্‌ছে।

এই যে আমার এক-আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চ'লে চ'লে নিজেকে নিত্য উপলব্ধি কর্‌তে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্চে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোসামারু জাহাজ
২০শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৩

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাক্‌তেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েছে। তার কূলের বেড়ি

খ'সে গেছে। কিন্তু এখনও তার মাটীর রং ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি,—কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে-ঢেউ দিয়েছে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদ বিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা—কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দ্দূল বিক্রীড়িত সুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নিচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক-প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশ মাদ্রাজি, এবং তারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্চে। তাদের পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি ক'রে ছবি আঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুসি হয়েছে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারো সাধ্য নয়। কোনো মতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্চে। একটা জিনিষ ভারি চোখে লাগে, সে হচ্চে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার—কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে,—বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিবড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই,—যেখানে ব'সে খাচ্চে তা'র নেহাৎ কাছে ছিবড়ে ফেলছে;—এমনি ক'রে চারিদিকে কত আবর্জ্জনা যে জমে উঠছে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে। আচারকে শক্ত ক'রে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়।

বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভালো কাপড়টি প'রে টুপিটি বাগিয়ে তারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে চায়। একটুমাত্র পরিচয় হোলেই অথবা না হোলেও তা'রা দেখা হোলেই প্রসন্ন মুখে সেলাম করে। বোঝা যায় তা'রা বাইরের সংসারটাকে মানে। কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় ব'লে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এই জন্যে আদব কায়দা মুসলমানের। আদব কায়দা হচ্চে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায় মা মাসী মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে;—কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্যে সম্পর্ক-বিচার ও জাতি-বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেছে। কেননা, প্রণাম নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্ব্বে আমরা অস্বীকার ক'রে চলেছিলুম ব'লেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছি, নয় ইংরাজের কাছ থেকে নিচ্চি। ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেই জন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হোলো না। বাঙালি ভদ্রসভায় সাজ-

সজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ,—সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বললেই হয়,—অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যে-রকম, অর্থাৎ দিগ্‌বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসী প্রভৃতি কোনো-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি,—নইলে আমরা থই পাইনে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, নয় অত্যন্ত দূরত্ব,—এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে, সেটা আজো আমাদের ভালো ক'রে আয়ত্ত হয় নি। এমন কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব ব'লে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে-সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারিনে, তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম ব'লে গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ ব'লেই এই সাধারণ আদব-কায়দাকে আমাদের কৃত্রিম ব'লে ঠেকে। বস্তুত ঘরের মানুষকে আত্মীয় ব'লে এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের ব'লে এবং তারও বাইরের মানুষকে মানব সমাজের ব'লে স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন,—এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাপ্তেন ব'লে রেখেছেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার নাবছে। কিন্তু শান্ত আকাশে সূর্য্য অস্ত গেল। বাতাসে যে-পরিমাণ বেগ থাকলে তাকে মন্দ পবন বলে, অর্থাৎ যুবতীর মন্দ গমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা করতে পারে,—এ তার চেয়ে বেশি; কিন্তু ঢেউগুলোকে নিয়ে রুদ্রতালের করতাল বাজাবার মতো আসর জমেনি,—যেটুকু খোলের বোল দিচ্ছে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা ব'লেও মনে হয়নি। মনে করলুম মানুষের কুষ্ঠির মতো, বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক মেলে

না,—এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙায় চিঠিপত্র সমর্পণ ক'রে দিয়ে প্রসন্ন সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের খচমচির মতো বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠ্‌ল। জলের উপর সূর্য্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন ক'রে নীলাম্বরীর ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে বসল। আকাশে তখনও মেঘ নেই, আকাশ-সমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগ্‌ল।

ডেকের উপর বিছানা ক'রে যখন শুলুম, তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চল্‌ছে—একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, আর একদিকে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে জবাব দিচ্চে, কিন্তু ঝড়ের পালা ব'লে মনে হোলো না। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি ক'রে কখন্‌ এক সময়ে চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোন একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি ক'রে সেইটে কা'কে বুঝিয়ে বল্‌ছি। আশ্চর্য্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্ত্তস্বরের মতো, অথচ তা'র মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই,—বল্‌ছে, যা থাকে কপালে। আর জলে যে বিষম গর্জ্জন উঠ্‌ছে, তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হোতে লাগ্‌ল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল করছে,—কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সঙ্কেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্চে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বাইরে জল-

বাতাসের গর্জ্জন, আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজ্‌তে লাগ্‌ল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাক্‌ল,—ঘুমচ্চি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে' ফুলে' ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হোলো। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলি বাকি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়্‌ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গা-ধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়-বীণা বাজাচ্চে? এর সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

এপর্য্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া এক রকম চ'লে যাচ্চে, এমন কি আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হোলো না। কাপ্তেনের মুখে কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি বললেন এই সময়টাতে এমন একটু আধটু হয়ে থাকে;—আমরা যেমন যৌবনের চাঞ্চল্য দেখে ব'লে থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাকলে ঝুমঝুমির ভিতরকার কড়াইগুলোর মতো নাড়া খেতে হবে তার চেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করাই ভালো। আমরা শাল কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বস্‌লুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম দিক থেকে আসছে, সেইজন্যে পূর্ব্বদিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ

রইল না। সমুদ্রের সে নীল রং নেই,—চারিদিক ঝাপসা বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে-ঘড়া উঠেছিল তার ঢাক্‌না খুল্‌তে তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হোলো, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি কর্‌তে কর্‌তে আকাশে উঠে পড়েছে।

জাপানী মাল্লারা ছুটোছুটি কর্‌ছে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা কর্‌ছে মাত্র;—পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তবে সে-সব বাধা ভেদ ক'রে এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো ক'রে উঠছে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বললেন,—ছোটো ঝড় সামান্য ঝড়। এক সময় আমাদের ষ্টুয়ার্ড এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে, ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কী রকম পথ বদল হয়েছে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারলুম না! ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বস্‌লুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলছে না, তার কারণ জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হোলো। চারিদিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত মৃত্যু—আমার প্রাণ এর মধ্যে

এতটুকু। এই অতি ছোটোটার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এত বড়োটাকে কিছু বিশ্বাস করব না?—বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

ডেকে ব'সে থাকা আর চল্‌ছে না। নিচে নাবতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি পর্য্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্ত্তি ক'রে ডেকপ্যাসেঞ্জার ব'সে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠ্‌ল। মনে হোলো দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বন্‌তি হচ্চে না; দুধ মথন করলে মাখন যে রকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে এসেচে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ্য করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা, আর জুতার ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাৎ, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে বন্ধন নেই, আর একটাতে বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে পেলুম ডেকের উপর কী যেন হুড়মুড় ক'রে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেলগুলো ডেকের উপর হা ক'রে নিশ্বাস নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে,—কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও ঝলকে ঝলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়ছে। বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেকট্রিক পাখা চল্‌ছে তাতে তাপটা যেন গায়ের উপর ঘুরে ঘুরে লেজের ঝাপটা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ মনে হয় এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে শরীর মন প্রাণের চেয়েও বড়ো একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নিচে যেমন শান্ত সমুদ্র—সেই

আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়ো, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেইরকম একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে—বিপদ এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে তাকে পাওয়া যায়—দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধ'রে যে চড় চাপড় খেয়েছে, তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানী মাল্লারা এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণ সংশয় ছিল; জাহাজ বরাবর আসন্ন সঙ্কটের সঙ্গে লড়াই করেছে, তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল—জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল।—কিন্তু ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট ক'রে আমাদের মনে পড়্‌ছে জাপানী মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি, ঝড়ের পর যেমন তা'র দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা কর্‌তে পারছে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম,—ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুল্‌তে পার্‌ছে না তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েছে।

আজ রবিবার। জলের রং ফিকে হয়ে উঠেছে। এত দিন পরে আকাশে একটি পাখী দেখ্‌তে পেলুম—এই পাখীগুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন ক'রে নিয়ে যায়—আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয়

তার গান। সমুদ্রের যা'-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের—তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে সুর নেই—সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্চে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্চে গতি। সমুদ্র হচ্চে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্চে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল করছিল, আমাদের জন্যে সেগুলো সমস্ত জমে রয়েছে;—বাণিজ্যের ধনের মতো নয় প্রতিদিন যার হিসাব চলছে; কোম্পানির কাগজের মতো, অগোচরে যার সুদ জম্‌ছে।

২৪শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৪

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে রেঙ্গুনে পৌঁছন গেল।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ ক'রে হজম হয়ে না গেলে সেটাকে নিজের ক'রে দেখানো যায় না। তা নাইবা দেখানো গেল—এমন কথা কেউ বলতে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কী?

দোষ না থাক্‌তে পারে,—কিন্তু আমার অভ্যাস অন্যরকম। আমি টুঁকে যেতে টেঁকে যেতে পারিনে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে সমস্ত টুক্‌রো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গ'লে ছাড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার

মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তা'র সঙ্গে আমার ব্যবহার।

ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিষ্ফল। অতএব আমার কাছ থেকে দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত তোমরা পাবে না। আদালতে সত্যপাঠ ক'রে আমি সাক্ষী দিতে পারি যে, রেঙ্গুন নামক এক সহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে-আদালতে আরো বড়ো রকমের সত্যপাঠ করতে হয়, সেখানে আমাকে বল্‌তেই হবে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হোতেও পারে রেঙ্গুন সহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক্‌তক্ করছে, রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্চে, তা'র মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙীন রেশমের কাপড়-পড়া ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখ্‌তে পাই, তখন মনে হয় এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয়, বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি—রেঙ্গুন সহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের সহর নয়, ওটা সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।

প্রথমত ইরাবতী নদী দিয়ে সহরের কাছাকাছি যখন আসচি, তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কী? দেখি তীরে বড়ো বড়ো সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিমনি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিৎ হয়ে প'ড়ে বর্ম্মা চুরুট খাচ্চে। তার পরে যত এগোতে থাকি, দেশ বিদেশের জাহাজের ভিড। তারপর যখন ঘাটে এসে পৌঁছই, তখন তট ব'লে পদার্থ দেখা যায় না—সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মতো ব্রহ্মদেশের গায়ে একেবারে ছেঁকে ধরেছে। তারপরে আপিস, আদালত, দোকান বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম, কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো

চেহারাই দেখ্‌তে পেলুম না। মনে হোলো রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে আছে কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ এ সহর দেশের মাটী থেকে গাছের মতো ওঠে নি, এ সহর কালের স্রোতে ফেনার মতো ভেসেছে,—সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন, অন্য জায়গাও তেমনি।

আসল কথা পৃথিবীতে যে-সব সহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে! দিল্লি বলো, আগ্রা বলো, কাশী বলো, মানুষের আনন্দ তা'কে সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্ম্মম, তার পায়ের নিচে মানুষের মানসসরোবরের সৌন্দর্য্য-শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়,—যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দ্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই ব'লেই বাংলা দেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট কর্‌তে পেরেছে।

আমি মনে করি আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্য্যতার লৌহ-বন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলি পর্য্যন্ত, গ্রাস কর্‌বার জন্যে ছুটে আস্‌ছিল, আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন ক'রে ধ'রে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌ত। একদিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিৎ বিচ্ছেদ দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভ'রে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেই জন্যেই কলকাতা আধুনিক সহর হোলেও কোকিল শিশুর মতো তার পালন-কর্ত্রীর

নীড়কে একেবারে রিক্ত ক'রে অধিকার করে নি। কিন্তু তারপরে বাণিজ্য-সভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হোতে চল্‌ল। এখন কলকাতা বাংলা দেশকে আপনার চারিদিক থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিচ্চে,—দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হোলো, কালের করাল মূর্ত্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিঃশ্বাস ছাড়্‌তে লাগ্‌ল।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে-পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্য্যে নয়, তার সৌন্দর্য্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতীর, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্য্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্য্যে বিচিত্র ক'রে সুন্দর ক'রে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তাঁর পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে? যখন থেকে কল হোলো বাণিজ্যের বাহন, তখন থেকে বাণিজ্য হোলো শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেষ্টরের তুলনা কর্‌লেই তফাৎটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্য্যে এবং ঐশ্বর্য্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেষ্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব্ব ক'রে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এই জন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেইখানেই আপনার কালিমায় কদর্য্যতায় নির্ম্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ ক'রে দিচ্চে। তাই নিয়ে কাটাকাটি হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হয়ে উঠ্‌ল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেষণের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান কর্‌বার খর্পর। তাঁর

স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হোলো। যাই হোক্, আমার বল্‌বার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

তাই বল্‌ছি, রেঙ্গুন তো দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোনো পরিচয় নেই ;—সেখান থেকে আমার বাঙালি বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আন্‌তে পারি নি। কথাটা হয়তো একটু অত্যুক্তি হয়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা কিছু দেখ্‌তে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা এব্‌স্‌ট্রাক্‌শন্‌ সে একটা আচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা সহর, কিন্তু কোনো-একটা সহরই নয়। এখন যা দেখছি, তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুসি হয়ে, সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। আধুনিক বাঙালির ঘবে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই ; তারা খুব গট্‌গট্‌ ক'রে চলে, খুব চট্‌পট্‌ ক'রে ইংরেজি কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে,—মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো ক'বে দেখছি, বাঙালির মেয়েটিকে নয় ; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝতে পারি এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলমল কর্‌ছে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগ্‌ল ; মনে হোলো, যা-ই হোক্‌ না কেন, এটা ফাঁকা নয়—যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন

সহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল—বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

প্রথমেই বাইরের প্রখর আলো থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে এসে প্রবেশ করলুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেছে—তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল, ফুল, বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি চলছে। যারা বেচছে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি সূর্য্যাস্তের আকাশের মতো বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কেনাবেচার কোনো নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মণিহারির দোকান খুলে বসে গেছে। মাছ মাংসেরও বিচার নেই, চারিদিকে খাওয়া দাওয়া ঘরকন্না চলছে। সংসারের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই—একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাটবাজারে যে-রকম গোলমাল, এখানে তা দেখা গেল না। চারিদিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, এই মন্দির সোপানে মাছমাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চলছে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন—তিনি ব'লে দিয়েছেন কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন; তিনি তো জোর ক'রে কারো ভালো করতে চান নি; বাহিরের শাসনে কল্যাণ নেই অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এই জন্যে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানাস্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য্য নেই, কারুকার্য্যের ঠেসাঠেসি ভিড়—সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না—এ যেন ছেলে-

ভুলোনো ছড়ার মতো ; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা-খুসি-তাই এসে পড়েছে, ভাবে পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখানকার নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসঙ্গতি ব'লে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা যেন একেবারে জানেই না। আমাদের কলকাতায় বড়োমানুষের ছেলের বিবাহ-যাত্রায় রাস্তা-দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বন্যা বয়ে যায়—কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়,—এও সেই রকম। এক ঘরে অনেকগুলো ছেলে থাক্‌লে যেমন গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ—এই মন্দিরের সাজসজ্জা, প্রতিমা নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম ছেলেমানুষের উৎসব—তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ঐ সোনা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্যমিশ্রিত হো হো শব্দ—আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। এদের যেন বিচার কর্‌বার গম্ভীর হবার বয়স হয়নি। এখানকার এই রঙিন মেয়েরাই সব চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভ'রে এরা যেন ফুল ফুটে রয়েছে। ভুঁইচাঁপার মতো এরাই দেশের সমস্ত—আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুন্‌তে পাই, এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরাম-প্রিয় ; অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা ক'রে থাকে। হঠাৎ মনে আসে এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু ফলে তো তার উল্টোই দেখ্‌তে পাচ্চি—এই কাজকর্ম্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি ক'রে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ কর্‌তে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সব

চেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সঙ্কীর্ণতাই হচ্চে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে নেই, রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তি-গৌরবে তেমনি তারা মহিয়সী। কর্ম্মতৎপরতাই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে—কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্ত্তিটিকে সুব্যক্ত ক'রে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে, তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীট্‌স্ বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি : অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্চেন, সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে, লোভে, ঈর্ষায় মূঢ়তায়, প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেক সময় বড়ো নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর ক'রে থাকে।

তোসা-মারু জাহাজ,
২৭শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৫

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকছি, আমাদের সঙ্গে যে-বালকটি এসেছে, তার নাম মুকুল, সে ব'লে উঠ্‌ল, ইস্কুলে একদিন পিনাং সিঙাপুর মুখস্থ ক'রে মরেছি—এ সেই পিনাং। তখন আমার মনে হে'লো ইস্কুলের ম্যাপে পিনাং দেখা যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মাষ্টার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হচ্চে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে "বস্তুতন্ত্রতা" খুব সামান্য। ব'সে ব'সে স্বপ্ন দেখ্‌বার মতো। না কর্‌ছি চেষ্টা, না কর্‌ছি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা-আপনি সব জেগে উঠ্‌ছে। এই সব দেশ বের করতে, এর পথ ঠিক ক'রে রাখ্‌তে, এর রাস্তাঘাট পাকা ক'রে তুল্‌তে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক দুঃসাহস কর্‌তে হয়েছে, আমরা সেই সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরব্বা উপভোগ কর্‌ছি যেন। এতে কোনো কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই,—কেবল শাঁসটুকু আছে, আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ছে, দিগন্তের উপর দিগন্তের পর্দ্দা উঠে উঠে যাচ্চে, দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি; অথচ আলিপুরে খাঁচার সিংহটার মতো তাকে দেখে আমোদ বোধ করছি; ভীষণও মনোহর হয়ে দেখা দিচ্চে।

আরব্য-উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়েছিলুম, তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল। এ তো সেই প্রদীপেরই মায়া। জলের উপরে স্থলের উপরে সেই প্রদীপটা ঘস্‌ছে, আর অদৃশ্য

দৃশ্য হচ্চে, দূর নিকটে এসে পড়ছে। আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আর জায়গাগুলোই আমাদের সামনে এসে পড়ছে।

কিন্তু মানুষ ফলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলানোটাই তার সব চেয়ে বড়ো জিনিষ। সেইজন্যে, এই যে ভ্রমণ করছি, এর মধ্যে মন একটা অনুভব করছে—সেটি হচ্চে এই যে, আমরা ভ্রমণ করছিনে। সমুদ্রপথে আসতে আসতে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা; ঠিক যেন কোন্ দানব-লোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে সমুদ্রের ধারে ঝিমতে ঝিমতে রোদ পোয়াচ্চে; মুকুল তাই দেখে বললে, ঐখানে নেবে যেতে ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছাটা হচ্চে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা। অন্য কর্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ঐ পাহাড়-ওয়ালা ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোর নাম জানিনে, ইস্কুলের ম্যাপে ও-গুলোকে মুখস্থ করতে হয় নি; দূর থেকে দেখে মনে হয় ওরা একেবারে তাজা রয়েছে, সার্কুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মতো মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যায় নি; সেই জন্যে মনকে টানে। অন্যের 'পরে মানুষের বড়ো ঈর্ষা। যাকে আর কেউ পায় নি, মানুষ তাকে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

সূর্য্য যখন অস্ত যাচ্চে, তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌছল। মনে হোলো বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী। জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখলুম। ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করছে। মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়গুলির উপরে যে একটি সুকোমল আলো পড়ছে সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ওড়নার মতো—তাতে বধূর মুখ ঢেকেছে না প্রকাশ করছে, তা বলা যায় না। জলে

স্থলে আকাশে মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণ-তোরণের থেকে স্বর্গীয় নহবৎ বাজতে লাগল।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মতো মানুষের সুন্দর সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। যেখানে প্রকৃতির ছন্দে লয়ে মানুষকে চল্‌তে হয়েছে, সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাক্‌তে পারে না। নৌকাকে জল বাতাসের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে হয়েছে, এই জন্যেই জল বাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েছে। কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা কর্‌তে পারে, সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠ্‌তে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁসে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড়ো হয়ে দেখা দিল, কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগ্‌ল, তখন দেখ্‌তে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কী কুশ্রীতাই সৃষ্টি করেছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ কর্‌ছে—এম্‌নি ক'রেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিচ্চে।

তোসা-মারু, পিনাং বন্দর।

৬

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নিচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখ দুটো মা-পৃথিবীর আদর পেয়ে পেটুক হয়ে গেছে। তার পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না,

ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হচ্চে বলা যায় না, দেখবার জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণেই পাই ব'লেই দেখবার জিনিষ সম্পূর্ণ ক'রে দেখি নে। এইজন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পেটুক চক্ষের পক্ষে এই রকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর। অভ্যাস দোষে প্রথমটা মনে হয় এ দুটো বুঝি একেবারে শূন্য থালা। তারপর দুই একদিন লঙ্ঘনের পর ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখ্‌তে পাই, যা আছে তা নেহাৎ কম নয়। মেঘ ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আস্‌ছে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ ক'রে তুল্‌ছে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি ব'লেই আকাশের দিকে তাকাইনে, আকাশের দিগ্‌বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ঐ আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে থাকতে হয়, তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক্ হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মতো, রূপ-রঙের রাগরাগিণীর আলাপ চল্‌ছে—তাল নেই, আকার আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেইসঙ্গে সমুদ্রের অপ্সর-নৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে রঙ্গ, সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা-কিছু মহান, তার চারিদিকে একটা বিরলতা আছে, তার পট-ভূমিকা (back ground)

সাদাসিদে। সে আপনাকে দেখবার জন্যে আর কিছু সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রসভা অসীম অন্ধকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সমুদ্র-আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ, সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্য্যাদা নষ্ট করে না। এরা হোলো জগতের বড়ো ওস্তাদ, ছলাকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপন হতে অগ্রসর হয়ে এদের কাছে যেতে হয়। মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস এবং "অন্যথাবৃত্তি" হয়ে থাকে, তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত ফাঁকা।

আমাদের সুবিধে হয়েছে, সামনে আমাদের আর কিছু নেই। অন্যবারে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি, তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে খেলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত। এক মুহূর্ত্তও তারা ফাঁকা ফেলে রাখতে চাইত না। তার উপরে সাজসজ্জা, কায়দাকানুনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের ডেকের সঙ্গে সমুদ্র-আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যাত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চারজন; বাকি দু-তিন জন ধীর প্রকৃতির লোক। তারপরে ঢিলাঢালা বেশেই ঘুমচ্ছি, জাগছি, খেতে যাচ্ছি, কারো কোনো আপত্তি নেই; তার প্রধান কারণ, এমন কোনো মহিলা নেই, আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁর অসম্ভ্রম হোতে পারে।

এই জন্যেই প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারছি, জগতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোম্‌টা খুলে' দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর

দেয়। স্বর্গমর্ত্ত্যের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্ত্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। নানা রকমের আকার;—কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কার-খানা-ঘরের চিম্‌নিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত কর্‌তে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা সে সহজেই মানুষের শাসন মানে; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রং যে কত রকম হোতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেম্‌নি। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য্য পাগলের মতো দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্চে সেও যেমন আশ্চর্য্য, পূর্ব্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য্য। প্রকৃতির হাতে অপর্য্যাপ্তও যেমন মহৎ হোতে পারে, পর্য্যাপ্তও তেমনি। সূর্য্যাস্তে সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায়-আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বল্‌তে পারে তা কেমন ক'রে বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায়, সমুদ্র সেই সময় তার ছোটো ছোটো লহরার কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্‌কে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র-আকাশের গীতিনাট্য-লীলায় রুদ্রের প্রকাশ কী-রকম দেখা গেছে, সে পূর্ব্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর এক ভঙ্গীতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চারিদিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জ্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সাম্‌নে জলের উপর পড়্‌ল, জল থেকে একটা বাষ্প-রেখা সাপের মতো ফোঁস ক'রে উঠ্‌ল। আর একটা বজ্র পড়্‌ল আমাদের সাম্‌নেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন স্যুইট্‌জারল্যাণ্ডের ইতিহাস-বিশ্রুত বার উইলিয়ম টেলের মতো তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগ্‌ল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বিদীর্ণ হয়েছে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য্য।

৭

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখ্‌ছি, আর মনে হচ্চে অনন্তের রং তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল।

এই আকাশ খানিক দূর পর্য্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ—ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর, সীমার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত; তারপরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুল্‌ছে।

এই প্রকারের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্ব্বস্ব ক'রে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা, পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি,—সমস্ত অতিক্রম ক'রে, বিপদকে উপেক্ষা ক'রে সে যে চলেছে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, "আরোর" দিকে প্রকাশের এই কুলখোয়ানো অভিসার-যাত্রা,—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য তো নয়,—কেননা ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আস্‌ছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে তো বুদ্ধিমানের চলা,—তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে-চলায় মরা বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়, কোনো নজির মান্‌তে গেলেই তাকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। তার এই

চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বল্‌ছে ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাক্‌ছে। নইলে কেউ কি সাধ ক'রে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজ্‌ছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিরাগী হযে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় ক'রে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে টানে, অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মর্‌তে মর্‌তে আকাশ-পারের ডানা মেল্‌তে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগচ্চে,—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্ব্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো ক'রে কুল আঁকড়ে ব'সে রইল—তারা কেবল শাসন মান্‌তেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য লীলাই হচ্চে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্চে বিধি!

আবার উল্টোদিক থেকে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই, ঐ কালো অনন্ত আস্‌ছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দমূর্ত্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেই জন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে, অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন ক'রে সাজাচ্চে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক

মুহূর্ত্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখ্‌তে পারেন না,—কেননা এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখীর পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধরা পড়্‌ছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের ?—অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ কর্‌ছেন, আপনাকে ত্যাগ ক'রে ক'রে ফিরে পাচ্চেন।

এই অব্যক্ত কেবলি যদি নাম-মাত্র, শূন্যমাত্র হ'তেন,—তাহোলে প্রকাশের কোনো অর্থই থাক্‌ত না, তাহোলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হোত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হোত, তাহোলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলি আরো-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন ক'রে তুল্‌ত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন—এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন? ঐ দিকে শূন্য নয় ব'লেই, ঐ দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে ব'লেই। সেই জন্যই উপনিষদ বলেছেন—ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখ্‌ছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আস্‌ছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুল্‌ছে কালোয়, কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উল্‌টে যায়। প্রকাশের একটা উল্টো পিঠ আছে, সে হচ্চে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হোতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিষ থাকাই চাই,—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্চে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উল্টো পিঠেই চোখ রাখে,—বলে সবই যাচ্চে,

কিছুই থাকছে না ; বলে জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখ্‌ছি, এ-সমস্তই "না" ; তাহোলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো ক'রে, ভয়ঙ্কর ক'রে দেখে ; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্চে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করূছে। আর অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্চে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ করূতে পারূছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই—আর যিনি কেবলমাত্র আছেন, তিনি স্থির, ঐ প্রলয়রূপিণী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই, এখানে যোগের অর্থ হচ্চে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যবসা করূছে। সে লোক করূছে কী ?—তার মূল-ধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনফা, অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করূছে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার ক'রে না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজছে,—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিক সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাঙ্কে জমানো কোম্পানি-কাগজের কুল ত্যাগ ক'রে, সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কী দেখ্‌ছি ?—না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়তঃ আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-

পাওয়াকে পাচ্চে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্চে।

কিন্তু মনে করা যাক্, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ঐ খরচের দিকের হিসাবটাই দেখ্‌ছে। বণিক কেবলি আপনার পাওয়া-টাকা খরচ ক'রেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে! সে বলে, এই তো প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো অঙ্কগুলো রক্তলোলুপ রসনা দুলিয়ে কেবলি যে নৃত্য কর্‌ছে। যা খরচ,—অর্থাৎ বস্তুত যা নেই,—তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধ'রে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেছে। একেই তো বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-অঙ্কটির চিরদীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পার্‌ছে না। এস্থলে মুক্তিটা কী? —না, ঐ সচল অঙ্কগুলোকে একেবারে লোপ ক'রে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্ব্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে-একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ থাকার দরুণ মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা ক'রে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখ্‌তে পায় না। তাই বলে—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

চীন সমুদ্র
তোসা-মারু
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

৮

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন হাতে-খাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও। যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রেই খাবাবের কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদগ্রহণের সুরু।

আমার তেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ সুরু হয়েছে। যদি ফরাসী-জাহাজে ক'রে জাপানে যেতুম, তাহোলে আঙুলের ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হোত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে ক'রে সমুদ্র যাত্রা করেছি—তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাৎ। সে সব জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হাসি তামাসা যে তার বন্ধ—তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনটা খুব টকটকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেছি, তার মধ্যে কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা তারা কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হোতে পারে আমি যদি য়ুরোপীয় হতুম, তাহোলে তারা যে কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু—তারা যে মানুষ—এটা আমার অনুভব করতে বিশেষ বাধা হোত না। কিন্তু এ জাহাজেও আমি বিদেশী,—একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা, একজন জাপানীর পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের

কাপ্তেনীটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্ম্মচারী, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্ম্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড়ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি,—দিব্যি সহজ ভাব। কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েছে, সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের ঘুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাক্‌বে।

আমাদের ক্যাবিনের যে ষ্টুয়ার্ড আছে, সেও দেখি তার কাজকর্ম্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হয়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথা-বার্ত্তা কচ্চি, তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁকচে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি, তিনি একদিন এসে আমাকে বললেন,— আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি ; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে করো, তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমতো সংক্ষেপে দু'চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।— তারপর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কী, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চল্‌ছে।

অন্য কোনো জাহাজের খাজাঞ্চি এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিম্বা নিজের কাজকর্ম্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে করতে পারিনে। এদের দেখে আমার মনে হয় এরা নূতন-জাগ্রত জাতি,—এরা সমস্তই নূতন ক'রে জানতে, নূতন ক'রে ভাবতে উৎসুক।

ছেলেরা নূতন জিনিষ দেখলে যেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এদের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্ব এই যে, একপক্ষে জাহাজের যাত্রী আর এক পক্ষে জাহাজের কর্ম্মচারী, এর মাঝখানকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাজাঞ্চির প্রশ্নের উত্তর লিখ্‌তে বসব, এ কথা মনে করতে তার কিছু বাধেনি,—আমি দুটো কথা শুনতে চাই, তুমি দুটো কথা বল্‌বে; এতে বিঘ্ন কী আছে? মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবী আছে, সেই দাবীটা সরলভাবে উপস্থিত করলে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয় তাই আমি খুসি হয়ে আমার সাধ্যমতো এই আলোচনায় যোগ দিয়েছি।

আর একটা জিনিষ আমার বিশেষ ক'রে চোখে লাগ্‌ছে। মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু জাহাজের কর্ম্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব কর্‌ছে। কী ক'রে জাহাজ চালায়, কী ক'রে গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে হয়, কাজ কর্‌তে কর্‌তে তারা এই সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম্ম আশাভরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের সখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখ্‌বে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আন্‌লে।

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ— এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বদেশের জিনিষ। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত ক'রে খাড়া ক'রে রাখে, সেখানে মানব-সম্বন্ধের দাবী ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম জাপান তো য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু এই জাপানী জাহাজে কাজ

দেখতে পাচ্চি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্চিনে। মনে হচ্চে যেন আপনার বাড়িতে আছি—কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্ম্মের কোনো খুঁৎ নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্ব্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবী মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবী করে। সেই জন্যে যেখানে আমাদের কোনো দাবী চলে না, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মুনিবের সঙ্গে বাঙালি কর্ম্মচারীর যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটে, তার কারণ এই,—ইংরেজি কর্ত্তা বাঙালি কর্ম্মচারীর দাবী বুঝ্‌তে পারে না, বাঙালি কর্ম্মচারী ইংরেজ কর্ত্তার কাজের কড়া শাসন বুঝতে পারে না। কর্ম্মশালার কর্ত্তা যে কেবলমাত্র কর্ত্তা হবে, তা নয়—মা বাপ হবে, বাঙালি কর্ম্মচারী চিরকালের অভ্যাস বশত এইটে প্রত্যাশা করে, যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজ কাজের দাবীকে মান্‌তে অভ্যস্ত, বাঙালি মানুষের দাবীকে মান্‌তে অভ্যস্ত,—এই জন্যে উভয় পক্ষে ঠিকমতো মিট্‌মাট্‌ হোতে চায় না।

কিন্তু কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ, এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হয়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে ক'রে থাকা যায় না। কেমন ক'রে সামঞ্জস্য হোতে পারে, বাইরে থেকে তার কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক ক'রে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতির ভিতর থেকে ঘটে। আমাদের দেশে প্রকৃতির এই ভিতরকার সামঞ্জস্য ঘ'টে

ওঠা কঠিন—কেননা যারা আমাদের কাজের কর্ত্তা, তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেছে, কিন্তু কাজের কর্ত্তা তারা নিজেই। এই জন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয়তো পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্য-ভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের ঝাঁজটা যখন কড়া থাকে, তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরো কড়া হয়; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আপনার কাজ করতে থাকে, এবং শিক্ষার কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন ক'রে নেয়। এই জীর্ণ ক'রে নেওয়ার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এই জন্যেই পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কী আকার ধারণ করবে, সেটা স্পষ্ট ক'রে দেখবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত এখন আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির কাজই হচ্চে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চল্‌চে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ এই জাহাজটুকুর মধ্যে আমি তো এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চি।

৯

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌছল। অনতিকাল পরেই একজন জাপানী যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তিনি এখানকার একটি জাপানী কাগজের সম্পাদক। তিনি আমাকে বললেন,

তাঁদের জাপানের সব চেয়ে বড়ো দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েছেন যে আমি জাপানে যাচ্চি, সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় করবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি বললুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মতো এইটুকুতেই মিটে গেল। আমাদের যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেছে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই—এরি মধ্যে যেন মেঘ ক'রে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড়ঘড় শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চল্‌তে লাগল। আমি কুঁড়ে মানুষ, কোমর বেঁধে সহর দেখ্‌তে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক-এ ব'সে মনকে কোনো মতে শান্ত ক'রে রাখবার জন্যে লিখতে বসে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানী মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লেখা বন্ধ ক'রে একটি ইংরাজি-বেশ-পরা জাপানী মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। তিনিও সেই জাপানী সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে, বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বললেন, আপনি যদি একটু সহর বেড়িয়ে আস্‌তে ইচ্ছা করেন তো আপনাকে সব দেখিয়ে আন্‌তে পারি। তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মতো পিষ্‌ছিল, কোথাও পালাতে পার্‌লে বাঁচি,—সুতরাং আমাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হোলো না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে ক'রে, সহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু নিচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের

স্রোত কল্‌কল্‌ ক'রে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিজ্‌ছে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ি। পথে ঘাটে চীনেই বেশি—এখানকার সকল কাজেই তা'রা আছে।

গাড়ি সহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তাঁর জাপানী জিনিসের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মনে মনে ভাবছি জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার খাবার সময় হয়ে এল; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় করছে কল্পনা ক'রে কোনো মতেই ফির্‌তে মন লাগ্‌ছিল না। মহিলাটি একটি ছোটো ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ কর্‌লেন। ফল খাওয়া হোলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ কর্‌লেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটেলে খাইয়ে আন্‌তে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন হয়ে উঠ্‌ছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্রস্তাব কর্‌লেন, এসো আমরা একটা কিছু ব্যবসা করি। স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের বংশে ব্যবসা তো কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ। শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে রাজি হয়ে জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুল্‌লেন। সে আজ আঠারো বৎসর হোলো। আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বললে, এইবার এরা মজ্‌ল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার-

কুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হোতে লাগ্‌ল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে—এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্চে।

বস্তুত এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে-কথা বল্‌ছিলুম, এই ব্যবসায়ে তা'রই প্রমাণ দেখ্‌তে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ—এই মেয়েটির মধ্যে আমরা তারই পরিচয় পেয়েছি। তারপরে কর্ম্ম-কুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে প'ড়ে তাদের কাজ কর্‌তে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্চে কর্ম্মপরতা। কর্ম্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য কর্‌তে পারে, তা নয়—তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এই জন্যে, যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না, সে সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভালো ক'রে কর্‌তে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেছে, সেখানে স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার প'ড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েছে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে; শুনেছি ফ্রান্সের মেয়েরাও ব্যবসায়ে আপনাদের কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। যে-সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে-সব কাজে পটুতা, পরিশ্রম, ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব চেয়ে দরকার, সে-সব কাজ মেয়েদের।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়্‌লে। ঠিক এই ছাড়্‌বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে প'ড়ে গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ঐ বিড়ালকে বাঁচানোই প্রধান কাজ হয়ে উঠ্‌ল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়্‌লে। এতে

জাহাজ ছাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড়ো আনন্দ দিয়েছে।

চীন সমুদ্র
তোসা-মারু জাহাজ
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

১০

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেছে, পালের নৌকার মতো। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করতে তারা বেরিয়েছে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবী মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখ্‌তে পারিনে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্য্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, তার আর একটা মুখ অন্ধকার—তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটাতেই চেতনার সমস্ত আলো খেল্‌ছে, অন্য একটা দিক আমরা ভুলেই গেছি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেয়ালেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি, কেবল যে সেই দিকেই লোকসান, তা নয়—সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে-পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে, তার লোকসানের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেই জন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উল্টোদিকে

টান আসে। সে বলে "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে ব'লে বসে, সংসার কারাগার; মুক্তি খুঁজতে শান্তি খুঁজতে সে বনে, পর্ব্বতে, সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে ব'লেই, বড়ো ক'রে প্রাণের নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এত বড়ো অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বল্‌তে হয়েছে,—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি, অবকাশ জিনিষটাকে তখন ডরাই। কেননা লোকালয় জিনিষটা একটা নিরেট জিনিষ, তার মধ্যে ফাঁক মাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকাটাকে কোনো মতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাস পাশা চাই, রাজা-উজির মারা চাই—নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাইনে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু অবকাশ হচ্চে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে, অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়,—একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখিনি, সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান, সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাক্‌লে মানুষের যেমন লজ্জা সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়, কেননা, ওটা কিনা শূন্য, তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য;—কিন্তু সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা তার অবকাশ পূর্ণতা,—সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতরো—যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে, সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে, সেখানে সুর

ভরাট। বস্তুত সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশি থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে!

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে ক'রে চলছি, এইবার আমরা কিছুদিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেছি। সৃষ্টির যে-পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড়, সেদিক থেকে যে-পিঠে একের আসন, সেদিকে এসেছি। দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ—এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত,—সে যে শুভ্র আলোর মতো পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেছে, অমৃতরসে তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এই জন্যে, অনেককে সত্য ক'রে জান্‌তে হোলে, সেই একেকে সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়। গাছ থেকে যে-ডাল কাটা হয়েছে, সে ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়, গাছে যে-ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক, তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা,—একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক, সেই তো মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্যদিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন কর্‌তেই হবে, তাতে আপত্তি কর্‌লে চল্‌বে না। যেমন ঘরে থাকতে হোলে দেয়াল না হোলে চলে না,—এও তেমনি। কিন্তু সবটাই তো দেয়াল নয়। অন্তত খানিকটা ক'রে জানালা থাকে—সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু সংসারে দেখ্‌তে পাই লোকে ঐ জানালাটুকু সইতে পারে না। ঐ ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্যে যতরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ঐ জানালাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি,

বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁস্‌ফাঁস্ মেরে দিয়ে, দশে মিলে ঐ ফাঁকটাকে একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিব্‌ড়ের মতো, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশি। ঘরে, বাইরে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আমোদে, আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব চেয়ে বড়ো— এর কাজই হচ্চে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু আলো হাওয়া আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিষ নয়, তাই লোকালয় পারৎপক্ষে তাদের জন্যে জায়গা রাখ্‌তে চায় না—তাই আবশ্যক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে, সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভর্ত্তি ক'রে দেয়। এম্‌নি ক'রে মানুষ আপনার দিনগুলোকে তো নিরেট ক'রে তুলেইছে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট ক'রে দেয়। ঠিক যেন কল্‌কাতার ম্যুনিসিপালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেল্‌তে হবে,—রাবিশ দিয়ে হোক্, যেমন ক'রে হোক। এমন কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি চাপা, জাহাজ-চাপা দিয়ে গলা টিপে মার্‌বার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কল্‌কাতা মনে পড়ে, ঐ পুকুরগুলোই ছিল আকাশের স্যাঙাৎ, সহরের মধ্যে ঐখানটাতে দ্যুলোক এবং ভূলোকে একটুখানি পা ফেল্‌বার জায়গা পেত, ঐখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য কর্‌বার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে, তা'র একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতালা হোতে পারে না, সে দশটা-চারটেকে স্বীকার করে, তার পার্ব্বণের ছুটি আছে, রবিবারকে মানে, পারৎপক্ষে রাত্রিকে সে ইলেক্‌ট্রিক্

লাইট্ দিয়ে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয়, আয়ু দিয়ে অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়—সহজে কেউ তার অপব্যয় কর্‌তে পারে না। কিন্তু অনাবশ্যকের তালমানের বোধ নেই, সে সময়কে উড়িয়ে দেয়, অসময়কে টিঁক্‌তে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিড়কির রাস্তা দিয়ে ঢোকে আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় হুড়্‌মুড়্ ক'রে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই ব'লেই তার ব্যস্ততা আরো বেশি।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই—এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ঐ লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয় দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হয়ে বেরই, সংসারে আর টেঁকা যায় না!

যাক্, যেমনি বেরিয়ে পড়েছি, অমনি বুঝতে পেরেছি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ, সেটাকে দিনরাত অস্বীকার ক'রে কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই, অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখ্‌তে পেলুম। "আমি আছি" এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ীর মধ্যে ভারি ভেঙে চুরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর, আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখ্‌লে তবে তার মানে বুঝতে পারি—তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে আনন্দ-লোকে তার অভ্যর্থনা দেখ্‌তে পাই,—তখন স্পষ্ট ক'রে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতস্য পুত্রাঃ ব'লে আহ্বান করেছিলেন।

১১

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ ক'রে আর এই হংকংএর ঘাট পর্য্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছি! সে যে কী প্রকাণ্ড, এমন ক'রে তাকে চোখে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না—শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে,—সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিল্‌ছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট,—এও সেই রকম; এই বাণিজ্য-ব্যাধটাও হাঁস্‌ফাঁস্ কর্‌তে কর্‌তে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পূর্‌ছে, সে দেখে ভয় হয়—তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী! লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্চে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম কর্‌ছে এবং লোহার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্ব্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান ক'রে দিচ্চে।

এ'কে দেখে মনে হয় যে এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার ল্যাজের আয়তন দেখ্‌লেই শরীর আঁৎকে ওঠে! তারপরে সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি প্রাণী হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি,—সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বল্‌তে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ঙ্কর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ

ল্যাজটা যখন নড়তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হোতে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তার-পরে, কেবলমাত্র তার বিপুল এই দেহটা রক্ষা কর্‌বার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র খাবা খাবা জিনিষ খাচ্চে তা নয়, সে মানুষ খাচ্চে—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু জগতের সেই প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলো টি‍ঁক্‌ল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হোলো। সৌষ্ঠব জিনিষটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁস্‌ফাঁস্‌টা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখিনে,—তখন বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হোতে হোতে, একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা কখনই কদর্য্য অমিতাচারকে অধিক দিন সইতে পারে না—তার ঝাঁটা এসে পড়ল ব'লে! বাণিজ্য-দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভাবের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন কর্‌ছে। একদিন আস্‌ছে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার ক'রে পুরাতত্ত্ববিদরা এই সর্ব্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর্‌বে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য্য নিয়ে নয়! মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয় শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশি নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের

উপর ভর না ক'রেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহ-পরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সে-ই পৃথিবীকে অধিকার করবে তার মানেই হচ্চে নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে; সে যত কম আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়; সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি ক'রে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্য-দানবকেও একদিন তার দানব-লীলা সম্বরণ ক'রে মানব হোতে হবে! আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই, সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনার ভার বাড়িয়ে চলেছে। কেবল-মাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর ক'রে ক'রেই ও জিত্‌তে চাচ্চে। কিন্তু একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোটো, তার কর্ম্মপ্রণালী সহজ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্য্যবোধকে, ধর্ম্মবুদ্ধিকে সে মানে; সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্য্যভাবে লুব্ধ নয়, তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত ক'রে বড়ো নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি ক'রে বড়ো। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী, আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করছে, আপন আবর্জ্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ,—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং মানব-হৃদয়ের বিরুদ্ধে, এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করছেই, তার সন্দেহ নেই। মুনফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই

হবে। যে-খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান ক'রে চলেছে, সে কখনই চল্‌বে না।

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি, বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে—হংকং বন্দরে পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরণা ঝরে পড়েছে। মনে হচ্চে দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেছে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে! এণ্ড্রুজ সাহেব বল্‌ছেন দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কটল্যাণ্ডের হ্রদের মতো, তেমনিতরো ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেম্‌নিতরো ভিজে কম্বলের মতো আকাশের মেঘ, তেম্‌নিতরো কুয়াসার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে-ফেলা জলস্থলের মূর্ত্তি। কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েছে—কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন ক'রে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না ক'রে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। একধারে দাঁড়িয়ে ঐ বাদ্‌লার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম "শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে।" এমনি ক'রে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম,—বানিয়ে বানিয়ে একটা নূতন গানও তৈরি করলুম,—কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত্ত্যবাসীকেই হার মান্‌তে হোলো। আমি অত দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক না, বায়ুবলে আকাশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন?

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু এই-খানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল তাই পদে পদে দেরি হোতে লাগল। জায়গাটাও সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কট-ময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের

হিসাব ক'রে চলেছেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন! মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠছে, এঞ্জিন থেমে যাচ্চে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। আজ সকালে আহারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি প'রে নেমে এসে আমাকে ব'লে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা বাতাসের বদল হচ্চে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড়ো আনন্দ হয়েছিল। —জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িবাঁধা চামড়ার চোঙে ক'রে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা হয়। কাল বিকেলে এক সময়ে মুকুলের হঠাৎ জান্‌তে ইচ্ছা হোলো, এর কারণটা কী? সে তখনি উপরতলায় উঠে গেল। এই উপরতলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং এখানেই পথ-নির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল, তখন তৃতীয় অফিসার কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাঁকে প্রশ্ন কর্‌তেই, তিনি ওকে বোঝাতে সুরু কর্‌লেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইছে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা ক'রে সেই ধারাপথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের ক'রে তাদের গতিবেগের সঙ্গে জাহাজের গতি-বেগের কী রকম কাটাকাটি হচ্চে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগ্‌লেন। তাতেও যখন সুবিধা হোলো না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল ক'রে দিলেন।

বিলিতি জাহাজে মুকুলের মতো বালকের পক্ষে এটা কোনোমতেই সম্ভবপর হোত না। সেখানে ওকে অত্যন্ত সোজা ক'রেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের উপরে জাপানী অফিসারের সৌজন্য,

কাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, এই জাপানী জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা প'ড়ে যায় নি, তাও বারবার দেখেছি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে ব'সে কাজ করবার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়াসন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে জাহাজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে আমাদের প্রস্তাব উঠ্‌ল, উপরের তলায় যাওয়া যাক। আমি সম্মতির জন্য প্রধান অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলুম,—তিনি তখনি বললেন, "না"। নিয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হোত না, কেননা কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে, অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না। উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুসি হয়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুসি হলুম। স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম, এর মধ্যে দাক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসার এসে আমাকে বললেন এ যাত্রায় আমাদের সাঙ্ঘাই যাওয়া হোলো না, একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন? তিনি বললেম, জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তাই আমাদের সদর আফিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না ক'রে চলে যেতে। সাঙ্ঘাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এইখানেই নামিয়ে দেব—অন্য জাহাজে ক'রে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখ্‌বার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখ্‌বার কারণ হচ্চে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে, সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ঐ একই

কথা। অর্থাৎ ব্যবসার দাবী সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া ক'রে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানব-সম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাক্‌বে। সেই দুদিনের জন্যে সহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মতো কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভালো; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার ক'রেও, জাহাজে রয়ে গেলুম। সে জন্যে আমার যে বক্‌শিস্‌ মেলেনি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়্‌ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা ক'রে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশ-মাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি ঢেউ খেলাচ্চে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করেছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই! তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সঙ্গীতের মতো বেজে উঠ্‌ছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখ্‌তে যে আমার এত আনন্দ হবে, একথা আমি পূর্ব্বে মনে কর্‌তে পার্‌তুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর কর্‌তে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর ক'রে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর ক'রে বল্‌তে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রী-

লোকের দেহ সুন্দর হোতে পারে না,—কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সাম্‌নেই আর একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্ম্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান কর্‌ছিল,—মানুষের শরীরে যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন ক'রে আর কোনোদিন দেখ্‌তে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখ্‌তে পেয়ে, আমি মনে মনে বুঝ্‌তে পার্‌লুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্চে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ কর্‌বার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্চে। যে-সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার কর্‌বার শক্তি পায় তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না,—সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ কর্‌তে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্চে,—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে ব'লেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে—কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিত্‌তে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়।

এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আমাদের আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে? তখন তার কর্ম্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ কর্‌ছে, তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু যে জাতির যে দিকে যত-

কথা। অর্থাৎ ব্যবসার দাবী সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া ক'রে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানব-সম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাক্‌বে। সেই দুদিনের জন্যে সহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মতো কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভালো; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার ক'রেও, জাহাজে রয়ে গেলুম। সে জন্যে আমার যে বক্‌শিস্ মেলেনি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়্‌ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা ক'রে নীল পারজামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশ-মাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি ঢেউ খেলাচ্চে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করেছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই! তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সঙ্গীতের মতো বেজে উঠ্‌ছে! জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখ্‌তে যে আমার এত আনন্দ হবে, একথা আমি পূর্ব্বে মনে কর্‌তে পার্‌তুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর কর্‌তে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর ক'রে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর ক'রে বল্‌তে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রী-

লোকের দেহ সুন্দর হোতে পারে না,—কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সাম্‌নেই আর একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্ম্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান কর্‌ছিল,—মানুষের শরীরে যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন ক'রে আর কোনোদিন দেখ্‌তে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখ্‌তে পেয়ে, আমি মনে মনে বুঝ্‌তে পার্‌লুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্চে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ কর্‌বার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্চে। যে-সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার কর্‌বার শক্তি পায় তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না,—সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ কর্‌তে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্চে,—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে ব'লেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে—কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিত্‌তে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়।

এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আমাদের আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে? তখন তার কর্ম্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ কর্‌ছে, তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু যে জাতির যে দিকে যত-

খানি বড়ো হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি বড়ো হয়ে উঠ্‌তে দিতে বাধা দেওয়া যে স্বজাতি পূজা থেকে জন্মেছে, তার মতো এমন সর্ব্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্ব্বর জাতির কথা শোনা যায়, যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়,—আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিষ, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে জাতি দেশকে দেশ দাবী করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস কর্‌ছে এবং কাজ কর্‌ছে। কাজের সেই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগ্‌ল। কাজের এই মূর্ত্তিই চরম মূর্ত্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়,—বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘরকর্‌না, স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস ক'রে চল্‌তে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাস-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি ক'রে তোলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন কর্‌তে থাকে, তাহোলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে, সকলে মিলে কাজ কর্‌বার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখ্‌তে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারোআনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্চে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলি বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না;—এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারিদিকে কেবলি জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচার-ধর্ম্মের সঙ্গে কাল-ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব।

চীন সমুদ্র

তোসা-মারু জাহাজ

১২

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের "কোবে" বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টিবাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র-যাত্রীদের ইসারা কর্‌ছে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা;—বাদ্‌লার হাওয়ায় সর্দ্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যে-রকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেইরকম ঘোরতর সর্দ্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাঁট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানী যাত্রী দেশে ফির্‌ছেন, তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেছেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ কর্‌বার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোটো নীলাভ পাহাড় মানস-সরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নিচে নেবে গেলেন, তাঁর সেই চোখে ঐ পাহাড়টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখ্‌ছি নূতনকে, তিনি দেখ্‌ছেন তাঁর চিরন্তনকে; আমরা অনেক তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখ্‌ছি, তিনি ছোটো বড়ো সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ ক'রে দেখ্‌ছেন,—এই জন্যেই ছোটোও তাঁর কাছে বড়ো, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া; অনেক তাঁর কাছে এক। এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানী অপ্সরা নৌকা, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্য্যদেবের নিমন্ত্রণ

সেইখানে নৃত্য কর্‌ছে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েছে,—ভাবলুম এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে ব'সে, সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভালো ক'রে দেখে নিই।

কিন্তু সে কি হবার জো আছে? নিজের নামের উপমা গ্রহণ কর্‌তে যদি কোনো অপরাধ না থাকে, তাহোলে বলি আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েছেন, তখন আমার পালা আরম্ভ হোলো। আমার চারিদিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখ্‌তে পেলুম না। খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে।

কোবে সহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙালির ছিটেফোঁটাও কিছু পাওয়া যায়। আমি হংকং সহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম, তাঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে ধর্‌লেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইক্কন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কাট্‌সুটাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেই সঙ্গে সানো এসে উপস্থিত,—ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়াগুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন, তখন ভাবনার অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে উঠ্‌ল। জাপানী পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে টানাটানি কর্‌তে লাগ্‌লেন—কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্ব্বেই গ্রহণ করেছি। এই নিয়ে বিষম একটা সঙ্কট উপস্থিত হোলো।

কোনো পক্ষই হার মান্‌তে চান না। বাদ বিতণ্ডা বচসা চল্‌তে লাগ্‌ল। আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারিদিকে পাক-খেয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন! দুটোর মধ্যে যদি বাছাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিষের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে হয়; সেই বেশিটুকুর বোঝা বিষম বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা যে ফসলের পক্ষে বেশি মুস্কিল জানিনে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি—তাঁরই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছি। সেই সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত।

এই উৎপাতটা আশা করিনি। জাপান যে নতুন মদ পান করেছে, এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিষটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্বুদ-পুঞ্জ;—এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝিনে;—এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভর্ত্তি ক'রে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সাম্‌নে প্রকাশ করে। এই মাৎলামিটাই আমাকে সব চেয়ে পীড়া দেয়। যাক্‌গে।

মোরারজির বাড়ীতে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় কাল রাত্তিরটা কেটেছে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানী দাসী! মাথায় একখানা ফুলে-ওঠা খোঁপা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ছোটো, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড়

বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি; কবিরা সৌন্দর্য্যের যে-রকম বর্ণনা ক'রে থাকেন, তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের; অথচ মোটের উপর দেখ্‌তে ভালো লাগে; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে, মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাস বশত ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখ্‌লুম, প্রতিবেশী-দের বাড়ীতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগ্‌তে আরম্ভ করেছে—সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল ক'রে সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত মেয়েদেরই হাতে,—এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় ব'লে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে-কারণেই হোক্, মেয়েরা যেখানে এই কর্ম্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য্য হানি হোতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইছে, এ আমার দেখ্‌তে ভারি সুন্দর লাগ্‌ছে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি, আর মনে মনে ভাবছি মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মতো একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবনচাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

কোবে

১৩

নতুনকে দেখ্‌তে হোলে, মনকে একটু বিশেষ ক'রে বাতি জ্বালাতে হয়। পুরোনোকে দেখ্‌তে হোলে, ভালো ক'রে চোখ মেলতেই হয় না। সেইজন্যে নূতনকে যত শীঘ্র পারে দেখে নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে। খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উস্‌কে রাখতে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল,—দেশে থাক্‌তে বই প'ড়ে, ছবি দেখে জাপানকে যে-রকম বিশেষভাবে নতুন ব'লে মনে হোত, এখানে কেন তা হচ্চে না ?—তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে আরম্ভ ক'রে সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে মনের নতুন দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন বিদেশী সমুদ্রের এ-কোণে ও-কোণে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো উঁকি মার্‌তে থাকে, তখন বল্‌তে থাকি, বাঃ! তখন মুকুল বলে, ঐখানে নেবে গিয়ে থাক্‌তে বেশ মজা! ও মনে করে এই নতুনকে প্রথম দেখার উত্তেজনা বুঝি চিরদিনই থাক্‌বে ; ওখানে ঐ ছোটো ছোটো পাহাড়গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি ক'রে সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে ; যেন ঐখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ঐ পাহাড়গুলোর ঝাপসানীল ছাড়া আর কিছুর দরকারই হয় না। তার পরে বিরল ক্রমে অবিরল হোতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক-একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চল্‌ল ; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপরে অনাদরে প'ড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে, তখন দেখাটাই কমে যায়। নূতনকে ভোগ ক'রে নতুনের ক্ষিদে ক্রমেই ক'মে।

হপ্তাখানেক জাপানে আছি কিন্তু মনে হচ্চে যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নূতন সেইটুকু তেমন গভীর নয়, তাদের মধ্যে যেটা পুরোনো সেইটেই পরিমাণে বেশি। অফুরান নতুন কোথাও নেই; অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসঙ্গত কিছুই নেই। প্রথমে ধাঁ ক'রে চোখে পড়ে, যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না। তারপরে পুরোনোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায় কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেইগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেল্‌তে ব'সে আমরা হাতে কাগজ পেলে রং এবং মূল্য-অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই,—এও সেই রকম। শুধু তো নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে যে ব্যবহার করতে হবে; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোনো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয় তখন দেখতে পাই, তত বেশি নতুন নয় যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল; আসলে পুরোনো, ভঙ্গীটাই নতুন।

তারপরে আর এক মুস্কিল হয়েছে এই যে, দেখতে পাচ্চি পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্ত্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেছে। আমার এই জানালায় ব'সে কোবে সহরের দিকে তাকিয়ে, এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান,—এ তো রক্তমাংসের নয়। একদিকে আমার জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে সহর। চীনেরা যেরকম বিকটমূর্ত্তি ড্র্যাগন আঁকে—সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারি পিঠের আঁসের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করছে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিত,—এই দরকার নামক দৈত্যটা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে, তা ফলেশস্যে

বিচিত্র এবং সুন্দর ; কিন্তু সেই অন্নকে যখন গ্রাস করতে যাই, তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড ক'রে তুলি ; তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি। কোবে সহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার ক'রে দিয়েছে। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে হাঁ করতে করতে পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস ক'রে ফেলছে। প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হয়ে আসছে।

যেদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড়ো ক'রে দেখতে পাচ্চি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্চে, এর আগে কোনো দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোটো ক'রে দেখেছিল। ব্যবসাকে তারা নিচের জায়গা দিয়েছিল ; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা ক'রে, বিদ্যাদান ক'রে, আনন্দ দান ক'রে যারা টাকা নিয়েছে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশি দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তিই এতই বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে যে দরকার এবং দরকারের বাহন-গুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ, টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে ক'রে সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্চে। অথচ এটা কেবল দায়ে-প'ড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে-

মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্ব্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠ্ছে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখ্তে পাচ্চি নে, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানে সহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজ সজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশঃ বিদায় নিচ্চে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোষাক ছেড়ে আপিসের পোষাক ধরেছে। আজকাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেইজন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার বল্ছে—, আমার ঐ হ্যাট্ কোটের দরকার আছে; আইনজীবীও তাই বল্ছে, বণিকও তাই বল্ছে। এম্নি ক'রেই দরকার জিনিষটা বেড়ে চল্তে চল্তে, সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিতভাবে একাকার ক'রে দিচ্চে।

এইজন্যে জাপানের সহরের রাস্তায় বেরলেই, প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝ্তে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারো কারো কাছে শুন্তে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে কথা সত্য কি মিথ্যা জানিনে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়—সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে খাতির করেনি, সেই জন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিষ এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের

ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারেই নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এপর্য্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে ক'রে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে,—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিকল্ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে—আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিকল্-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলে না। এখানকার বাঙালিদের কাছে শুনতে পেলেম যে,রাস্তায় দুই বাইসিকলে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিকলের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না ক'রে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ জাপানী বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি ক'রে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই ব'লে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেই জন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে—জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হচ্চে, এরা নিজেকে সর্ব্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে গ'লে পড়তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা,—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্চে, এ আমি

শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরণার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এ পর্য্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্চে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্য্যবোধে। সৌন্দর্য্য-বোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখী, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্য্যভোগের সম্বন্ধ – এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোণো কবিতার নমুনা দেখ্‌লে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :—

পুরোণো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস্! আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোণো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়্‌তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কী রকম স্তব্ধ। এই পুরোণো পুকুরের ছবিটা কী ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইসারা ক'রে দিলে—তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

আর একটা কবিতা :—

পচা ডাল
একটা কাক,
শরৎ কাল।

আর বেশি না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক ব'সে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্চে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক ব'সে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সাম্‌নে দেখ্‌তে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত ক'রে দিয়েই স'রে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয়, তার কারণ এই যে, জাপানি-পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়ো :—

স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য হচ্চে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্চেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্চে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গমর্ত্ত্যকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর ক'রে দেখ্‌ছে—ভারতবর্ষ বল্‌ছে, এই যে একবৃন্তে দুই ফুল,—স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ,—মানুষের হৃদয় যদি না থাকত, তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হোত;—এই সুন্দরের সৌন্দর্য্যটিই হচ্চে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক্, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ কর্‌ছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, এ'কে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব্ব ক'রে আর-একটাকে বাড়ানো

চলে, এ আমরা দেখেছি। সৌন্দর্য্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব্ব ক'রে সৌন্দর্য্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে,—এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এখানে এত বেশি ক'রে এমন সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাই যে, স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্-বোধের মতো, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে-লোক অত্যন্ত গরীব, সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা ক'রেও এক আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে, আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝ্‌তে পারছিলুম।

একটা বইয়ে পড়্‌ছিলুম, প্রাচীন কালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশকালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝ্‌তে পারবে, জাপানী নিজের এই সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকে সৌখীন জিনিস ব'লে মনে করে না; ওরা জানে গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হচ্ছে শান্তি;

যে-সৌন্দর্য্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ, তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে, এবং যে উত্তেজনাপ্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন ক'রে তোলে, এই সৌন্দর্য্যবোধ তাকে পরিশ্রান্ত করে।

সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদেব নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার Book of Tea পড়েছ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারলুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য কর্‌ছে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর যানে ক'রে গিয়ে,প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ কর্‌লুম—সে বাগান ছায়াতে, সৌন্দর্য্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিষটা যে কী, তা এরা জানে। কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে, মাটির উপরে জিযোমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানী-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়। জাপানীর চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্য্যের দীক্ষালাভ করেছে,—যেমন ওরা দেখ্‌তে জানে, তেমনি ওরা গড়্‌তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তারপরে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বস্‌লুম। নিয়ম হচ্চে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে ব'সে থাক্‌তে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত ক'রে স্থির কর্‌বার জন্যে, ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম কর্‌তে কর্‌তে, শেষে আসল

জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত—কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠ্‌তে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কী-একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্ কর্‌ছে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে জিনিষ যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিষগুলিকে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর কর্‌তে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা ক'রে ক'রে, স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত ক'রে তুলে, তার পরে এইরকম দুটি একটি ভালো জিনিষ দেখালে, সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম। আমার মনে পড়্‌ল, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-একদিন এক-একটি গান তৈরি ক'রে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কল্‌কাতায় এনে যখন বান্ধব-সভায় ধরেছি, তখন তা'রা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত ক'রে রেখেছে। তার মানেই কল্‌কাতার বাড়িতে গানের চারিদিকে ফাঁকা নেই—সমস্ত লোকজন, ঘরবাড়ি, কাজকর্ম্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। যে-আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তারপরে গৃহস্বামী এসে বললেন,—চা তৈরি করা এবং পরিবেষণের ভার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে

এসে, নমস্কার ক'রে, চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে, চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোওয়া মোছা, আগুনজ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আস্‌বাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্ত্তব্য হচ্চে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত ক'রে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্য্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়;—কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই;—মনের উপরতলায় সর্ব্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলি ঢেউ উঠ্‌ছে,—তার থেকে দূরে, সৌন্দর্য্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত ক'রে দেওয়াই হচ্চে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্য্যবোধ, সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিষটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্ব্বল করে। কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেই জন্যেই জাপানীর মনে এই সৌন্দর্য্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হোতে পেরেছে।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বল্‌বার আছে। এখানে মেয়ে পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখ্‌তে পাইনে। অন্যত্র

মেয়েপুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয় এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই, তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি ক'রে, এখানে স্ত্রীপুরুষের দেহ, পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্চে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে, তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত,—এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিষ ব'লে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি ব'লেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। আরো একটা জিনিষ দেখ্‌তে পাই! এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক ব'লে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্ব্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে, যাতে বোঝা যায় তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবী রেখেছে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানীদের মধ্যে চরিত্র-দৌর্ব্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বল্‌ছি নে,কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহ-পরিবেষ্টন রচনা করেছে, জাপানীর মধ্যে অন্তত তার একটা আয়োজন কম ব'লে মনে

হোলো, এবং অন্তত সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর একটি জিনিষ আমাকে বড়ো আনন্দ দেয়, সে হচ্চে জাপানের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বদা এত বেশি পরিমাণে এত ছোটো ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি। আমার মনে হোলো, যে-কারণে জাপানীরা ফুল ভালোবাসে, সেই কারণেই ওরা শিশু ভালোবাসে। শিশুর ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিম মোহ নেই—আমরা ওদের ফুলের মতোই নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে ভালোবাস্‌তে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও টোকিয়ো যাত্রা করব। একটি কথা তোমরা মনে রেখো—আমি যেমন যেমন দেখ্‌ছি, তেমনি তেম্‌নি লিখে চলেছি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন কি, অল্প পরিমাণেও "বস্তুতন্ত্রতা" দাবী করো তো নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্য-সমিতি নির্ব্বাচন করবেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা-কিছু মতামত প্রকাশ ক'রে চলেছি, তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড়ো—তাহোলেই ঠক্‌বে না। ভুল বল্‌ব না, এমন আমার প্রতিজ্ঞা নয়;—যা মনে হচ্চে তাই বল্‌ব, এই আমার মৎলব।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

কোবে।

১৪

যেমন-যেমন দেখ্‌ছি তেম্‌নি-তেম্‌নি লিখে যাওয়া আর সম্ভব নয়। পূর্ব্বেই লিখেছি, জাপানীরা বেশি ছবি দেওয়ালে টাঙায় না, গৃহসজ্জায় ঘর ভ'রে ফেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয়, তা তারা অল্প ক'রে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী ব'লেই, দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নাই। এরা জানে, অল্প ক'রে না দেখ্‌লে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা সম্বন্ধেও আমার তাই ঘট্‌ছে;—দেখবার জিনিষ একেবারে হুড়মুড় ক'রে চারিদিকে থেকে চোখের উপর চেপে পড়ছে;—তাই প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে দেখা এখন আর সম্ভব হয় না। এখন কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চল্‌তে হবে।

এখানে এসেই আদর অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে প'ড়ে গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারিদিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েছে। এদের ফাঁক দিয়ে যে জাপানের আর কিছু দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা ছেঁকে ধরে, রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়্‌তে সঙ্কোচ করে না।

এই কৌতূহলীর ভিড় ঠেলতে ঠেল্‌তে, অবশেষে টোকিয়ো সহরে এসে পৌছনো গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইক্কানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ করতে হোলো। বুঝলুম জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিষটাই ঘরের। ধূলো জিনিষটাও দেখ্‌লুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার

সমস্ত ঘর এবং পথ মাদুর দিয়ে মোড়া, সেই মাদুরের নিচে শক্ত খড়ের গদি; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না, তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধ্বড় পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর একটা ব্যাপার এই,—এদের বাড়ি জিনিষটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানালা, দরজা, যতদূর পরিমিত হোতে পারে, তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। এ'কে মাজা ঘষা ধোওয়া মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তারপরে, ঘরে যেটুকু দরকার, তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল মেঝে সমস্ত যেমন পরিষ্কার, তেমনি ঘরের ফাঁকটুকুও যেন তক্তক্ করছে তার মধ্যে বাজে জিনিষের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত সুবিধে এই যে, এদের মধ্যে যাদের সাবেক চাল আছে, তারা চৌকি টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে চৌকি টেবিলগুলো জীব নয় বটে, কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার নেই তখনো ত'ারা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আসছে যাচ্ছে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেজের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন ত'ারা চ'লে যায়, তখন ঘরের আকাশে ত'ারা কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ করা কাষ্ঠখণ্ড ঝকঝক করছে, সেই দিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলছে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানীর উপরে ফুল সাজানো। ঐ যে ছবিটি আছে, এটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, এটা দেখবার জন্যে। সেইজন্যে যাতে ওর গা ঘেঁসে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সামনে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারি ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর জিনিষকে যে তারা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই

তা বোঝা যায়। ফুল সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে—ঠিক যেমন ক'রে বারুণীযোগের সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়, তেমনি,—কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই—ওদের জন্যে থার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্যে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানালার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম, তখন বুঝ্‌লুম জাপানীরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ, তা নয়,—মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মতো আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে যে-জিনিষের মূল্য আছে গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী। বস্তু বাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোনো জিনিষ আঘাত কর্‌ছে না, কানকে বাজে কোনো শব্দ বিরক্ত কর্‌ছে না,—মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিষপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারিদিকে এলোমেলো, ছাড়াছাড়ি নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ,—সেখানে যে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হচ্চে, সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝ্‌তে পারি নে। আমাদের চারিদিকে যা-কিছু আছে, সমস্তই আমাদের প্রাণ-মনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় কর্‌ছেই। যে-সব জিনিস অদরকারী এবং অসুন্দর, তারা আমাদের কিছুই দেয় না—কেবল আমাদের কাছ থেকে নিতে থাকে।

এমন ক'রে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হচ্চে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হচ্চে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হোলো আমার মন যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। এতদিন যেরকম ক'রে মনের শক্তি বহন করেছি, সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে; আর এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়া-কর্ম্মের কথা মনে হোলো। কী প্রচুর অপব্যয়! কেবলমাত্র জিনিস-পত্রের গণ্ডগোল নয়,—মানুষের কী চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, গলা-ভাঙা-ভাঙি! আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হোলো। বাঁকাচোরা উঁচুনিচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মতো সেখানকার জীবন-যাত্রা। যতটা চল্‌ছে তার চেয়ে আওয়াজ হচ্চে ঢের বেশি। দরোয়ান হাঁক দিচ্চে, বেহারাদের ছেলেরা চেঁচামেচি কর্‌ছে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মাড়োয়াড়ি প্রতিবেশিনীরা চীৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেছে, তার আর অন্তই নেই। আর ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা,—তার বোঝা কি কম! সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন কর্‌ছে! তা নয়,—প্রতিক্ষণেই আমাদের মন বহন কর্‌ছে। যা গোছালো, তার বোঝা কম; যা অগোছালো, তার বোঝা আরো বেশি,—এই যা তফাৎ। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেঁচায়, কম জিনিস ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্ব্বক কাজ কর্‌তে যাদের আশ্চর্য্য দক্ষতা,—সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠেছে, তার কি হিসেব আছে?

জাপানীরা যে রাগ করে না, তা নয়—কিন্তু সকলের কাছেই এক-বাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের গালাগালির অভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার উর্দ্ধে এদের ভাষা পৌঁছয় না!

ঘোরতর রাগারাগি মনান্তর হয়ে গেল, পাশের ঘরে তার টুঁ শব্দ পৌঁছল না,—এইটি হচ্চে জাপানী রীতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এই রকম স্তব্ধতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হোত, তাহোলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাকৃত না। কিন্তু এই তো দেখ্‌ছি, এরা ঝগড়া করে না বটে, অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে এরা পিছ্‌পাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের তো কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্য্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেছি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে, "এটা আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদে পেয়েছি। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যে মধ্যপথের ধর্ম্ম।"

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুল্‌তে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল?

একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হোলো এ যেন দেহভঙ্গীর সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গীবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুল্‌তে দুল্‌তে সৌন্দর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি করৃছে। খাঁটি য়ুরোপীয়

নাচ অর্দ্ধনারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম আধখানা নাচ ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য ক'রে লাথিছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্য্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ইসারা-মাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জাপানীর মনে এমন সত্য যে. তার মধ্যে কোনো-রকমের মিশল তাদের দরকার হয় না, এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু এদের সঙ্গীতটা আমার মনে হোলো বড়ো বেশিদূর এগোয় নি। বোধ হয় চোক আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশি আনাগোনা করে তাহোলে অন্য রাস্তাটায় তার ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্চে অবনীর, গান জিনিষটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি ; অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান। রূপ-রাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্চে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর ; এই অর্থের যোগে ছবি গ'ড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানী রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা-কিছু চোখে পড়ে, তার কোথাও জাপানীর আলস্য নেই, অনাদর নেই ; তার সর্ব্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধন করেছে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ-রসের যে বোধ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এ-দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সর্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্ব্বজনীন সৈনিকতার চর্চ্চাও সেখানে অনেক জায়গায়

প্রচলিত,—কিন্তু এমনতরো সর্ব্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে? অকর্ম্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েছে?—ঠিক তার উল্টো। এরা এই সৌন্দর্য্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে; এই সৌন্দর্য্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য্য এবং কর্ম্মনৈপুণ্য লাভ করেছে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে, তারা মনে করে শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ। এবং কর্ত্তব্যের পথে চল্‌বার সদুপায় হচ্চে রসের উপবাস,—তারা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেলাকেই জগতের ভালো করা মনে করে।

য়ুরোপে যখন গেছি, তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপ খুব ক'রে চোখে পড়েছে এবং মনকে অভিভূত করেছে। তবু "এহ বাহ্য।" কিন্তু জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে যা চোখে পড়ে, সে হচ্চে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহঙ্কার নয়, আড়ম্বর নয়,—সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এই জন্যে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে আর-সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায়। কিন্তু পূজা আপনার চেয়ে বড়োকে প্রচার করে; এই জন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিচ্চে। এদেশে আসবামাত্র সকলের চেয়ে বড়ো বাণী যা কানে এসে পৌঁছয় সে হচ্চে "আমার ভালো লাগ্‌ল, আমি ভালো বাসলুম।" এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরো

শক্ত। এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে। প্রত্যেক ছোটো জিনিষে, ছোটো ব্যবহারে, সেই আনন্দের পরিচয় পাই। সেই আনন্দ, ভোগের আনন্দ নয়,—পূজার আনন্দ। সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা ক'রে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে, অন্য কোনো জাতি শেখে নি। যা এদের ভালো লাগে, তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই প্রচুরতার পরিচয়, এবং স্তব্ধতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেছে। এবং এরা বলে সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা থেকে পেয়েছে। এরা স্থির হয়ে শক্তিকে নিরোধ করতে পেরেছে ব'লেই, সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়—কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি, তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়োকে প্রকাশ করে, সেই বড়োর কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হোতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লীতে যেখানে প্রাচীন হিন্দু রাজার কীর্ত্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহঙ্কারের মুষলের মতো খাড়া হয়ে আছে, সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়, কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেছে, সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু যখন তাজমহলের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই, তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্ত্তি, না মুসলমানের কীর্ত্তি। তখন একে মানুষের কীর্ত্তি ব'লেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেটা অহঙ্কারের প্রকাশ নয়,—

আত্মনিবেদনের প্রকাশ ; সেই জন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এই জন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি, সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্ব্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রূর কর্ম্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে,—সে তো হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি—সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়—কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় ব'লেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে, অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেছি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে, সবই আমাদের শেখবার—এ কথা মানি ; কিন্তু যত ব্যবহার আছে, সবই যে আমাদের নেবার—এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিষ, তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে—এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই জন্যেই, জাপানে যে-সব ভারতবাসী এসেছে, তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই তারা তো য়ুরোপের নানা অনাবশ্যক নানা কুশ্রী জিনিষও নকল করেছে ; কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিষই চোখে দেখতে পায় না ? তারা এখান থেকে যে সব বিদ্যা শেখে, সেও য়ুরোপের বিদ্যা—এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্য-রকম সুবিধা আছে, তারা কোনোমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে-সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের

সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিষ কিছুই দেখি নে?

আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিষ আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি, এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসঙ্কোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তাহোলে আমাদের ঘর দুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হোত, সুন্দর হোত সংযত হোত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে, তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্চে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল য়ুরোপের কাছে,—তাই য়ুরোপের চেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অদ্ভুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা করতে চাই। এদিকে জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীরা বলে, জাপান আমাদের এসিয়াবাসী ব'লে অবজ্ঞা করে; অথচ আমরাও জাপানকে এমনি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ ক'রেও প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে, জাপানের ভিতর দিয়ে বিকৃত য়ুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানকে যদি দেখ্‌তে পেতুম তাহোলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা, অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চলে যেত।

বাংলা দেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিষটা যে কত বড়ো জিনিষ, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র সৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে—তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিয়োতে আমি যে শিল্পীবন্ধুর বাড়িতে ছিলুম, সেই টাইক্কানের নাম পূর্ব্বেই বলেছি, ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা; তাঁর হাসি, তাঁর চারিদিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েছে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যত দিন তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জান্‌তেই পারি নি তিনি কত বড়ো শিল্পী। ইতিমধ্যে য়োকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেছি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মতো এবং তিনিও সকল বিষয়ে এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম "হারা"। তাঁর কাছে শুন্‌লুন, য়োকোয়ামা টাইক্কান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন। হারার বাড়িতে টাইক্কানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে সৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম। বিষয়টা এই; চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর হয়ে চলেছে—তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্চে, তাতে তার নেই; তা'র পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দ্দার প্রচলন আছে, সেই রেশমের পর্দ্দার উপর আঁকা। মস্ত পর্দ্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিম্বা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই—যেমন উদার, তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না—নানা রং, নানা রেখার সমাবেশ নেই—দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড়ো এবং খুব সত্য। তারপরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র দেখ্‌লুম। একটি ছবি,—পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ, মাঝখানে একটি

নৌকা, নিচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্চে—আর কিছু না—জলের কোনো রেখা পর্য্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা,—এটা যে জল, সে কেবলমাত্র ঐ নৌকো আছে ব'লেই বোঝা যাচ্চে; আর এই সর্ব্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত কিছু কালিমা,—সে কেবলি ঐ দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁক্‌তে চেয়েছেন, যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ—জ্যোৎস্নারাত্রি,—অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করুতে যাই, তাহোলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলবে না। হারা সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সঙ্কীর্ণ ঘরে, সেখানে একদিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দ্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দ্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে—প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, শাদা শাদা ফুল ধরেছে—ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝ'রে ঝ'রে পড়্‌ছে;—বৃহৎ পর্দ্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা দিয়েছে—পর্দ্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্চে একটি অন্ধ হাতজোড় ক'রে সূর্য্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য্য, আর সোনায় ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধ'রে আমার কাছে দেখা দিলে,—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা—তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠ্‌ছে। অথচ আলোয় আলোময়—তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

কাল শিমোমুরার আর একটা ছবি দেখ্‌লুম। পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে ব'সে ধ্যান কর্‌ছে—তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারদিকে আক্রমণ করেছে। অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক জন্তুর মতো তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত—তাদের কেউ বা খুব সমারোহ ক'রে আস্‌ছে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মার্‌ছে। কিন্তু তবু এরা সবাই বাইরেই আছে—ঘরের ভিতরে তার সাম্‌নে সকলের চেয়ে তার বড়ো রিপু বসে আছে—তার মূর্ত্তি ঠিক বুদ্ধের মতো। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই দেখা যায়, সে সাঁচ্চা বুদ্ধ নয়,—স্থূল তার দেহ, মুখে তার বাঁকা হাসি। সে কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্র রূপ ধ'রে এই সাধককে বঞ্চিত কর্‌ছে। এ হচ্চে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধ'রে আছে—এ'কেই চেনা শক্ত—এই হচ্চে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্য্য রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ্য ক'রে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পূজা কর্‌ছে।

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্ব্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্‌ঘাটিত। মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে,—যে-খুসি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন কর্‌তে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই। আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চারদিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মতো তিনি মূল্যবান জিনিষকে কেবলমাত্র সংগ্রহ ক'রে রাখেন না,—তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত কর্‌তে জানেন।

১৫

এসিয়ার মধ্যে জাপানী এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্ব্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নিচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনোকালে আর ওঠার উপায় থাকবে না।

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকল, অম্‌নি সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ ক'রে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল কারখানা, আপিস আদালত, আইন কানুন যেন কোন আলাদিনের প্রদীপের যাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্ব্বলোকে একেবারে আস্ত উপ্‌ড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ ক'রে তোলা নয়;—তাকে জামাইয়ের মতো একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ ক'রে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে— য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি ক'রেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া ক'রে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে পড়্‌ল না তা নয়,— পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগল। প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া ক'রে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই ব'সে

গেছে—কেবল পালটা এমন আড় ক'রে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এত বড়ো আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস তো যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্ত্তে তাকে নারদমুনি ক'রে তোলা যেতে পারে। শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তাহোলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করবার মতো মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন ক'রে গড়ে তুল্‌লে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মান্‌তেই হবে, এ জিনিষ তাকে গোড়া থেকে গড়্‌তে হয়নি,—ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেই জন্যেই যেম্‌নি তার চৈতন্য হোলো, অমনি তার প্রস্তুত হোতে বিলম্ব হোলো না। তার যা-কিছু বাধা ছিল, সেটা বাইরের—অর্থাৎ একটা নতুন জিনিষকে বুঝে প'ড়ে আয়ত্ত ক'রে নিতে যেটুকু বাধা, সেইটুকু মাত্র;—তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দুরকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর, আর এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভেদ আছে, এমন কথা বল্‌তে চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে প'ড়ে চল্‌তে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে প'ড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম—লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এই জন্যে সে এক দৌড়ে দু' তিন শো বছর হু হু ক'রে পেরিয়ে গেল। আমাদের মতো যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্চে, তারা

অভিমান ক'রে বলে, "ওরা ভারি হাল্কা, আমাদের মতো গাম্ভীর্য্য থাক্‌লে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনও এত শীঘ্র গড়ে উঠ্‌তে পাবে না।"

আমরা যাই বলি না কেন, চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিট্‌ত না, এবং বর্ম্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেছে, সেটা জাপানী পেয়েছে কোথা থেকে?

জাপানীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্য্যরক্তেরও মিশ্রণ ঘটেছে। জাপানীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখ্‌তে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙালি কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানী ব'লে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেছি।

যে-জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্করতা খুব বেশি ঘটেছে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, একথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখ্‌তে চাই, তাহোলে বর্ব্বর

জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেছে, তারা অল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেছে। তাই আদিম অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না—আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বললেই হয়।

কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখানে একদিকে এসিয়া একদিকে ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেছে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না —রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও অনার্য্যে আর্য্যে যে মিশ্রণ ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীকেও দেখ্‌লে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা ক'রেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব্ব করে—জাপানীর মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীর মিশ্রণ হয়েছে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী, সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি—কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার কর্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত ঋণ তারাই গোপন কর্‌তে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম্ম প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ ক'রে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিষ তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতি-সঙ্করতা নয়, স্থান-সঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। ছোটো জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেছে। বিচিত্র উপকরণ ভালোরকম ক'রে গ'লে মিলে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। চীন বা ভারতবর্ষের মতো বিস্তীর্ণ জায়গায়, বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করে, সংহত হোতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীক, রোম, এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার কর্‌তে পেরেছে। আজকের দিনে এসিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম্ম আছে, যে জন্য কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ কর্‌তে পেরেছে; আর একদিকে অল্প পরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবতে, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হোতে পেরেছে। তাই যে-মুহূর্ত্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে, আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে চলেছে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম থাকাতেই, জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চল্‌তে পেরেছে, এবং তাতে ক'রে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্চে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করেছে; সুতরাং নিজের

বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারছে। এই সমস্ত নতুন জিনিষ যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্চে না, তা নয়, —কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম যা অসঙ্গত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্চে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্ত্তন ঘ'টে সুসঙ্গতি জেগে উঠ্‌ছে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেছে, আর একদিন সেটাকে ত্যাগ করেছে—একদিন যে আপন জিনিষকে পরের হাটে সে খুইয়েছে, আর একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্চে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চল্‌ছে। যে-বিকৃতি মৃত্যুর, তাকেই ভয় করতে হয়—যে-বিকৃতি প্রাণের লীলা-বৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয়, প্রাণ আপনি তাকে সাম্‌লে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম, তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেছে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে জাপানির এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। তারপরে বাঙালি ভারতের যে প্রান্তে বাস করে, সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে, অথবা যে কারণেই হোক্, আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত এক-ঘরে হয়ে ছিল—ওতে ক'রে তার একটা সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল—এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধন-মুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল,

এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই, তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হোত, তাহোলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত কর্‌ত। আজ নানাদিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠ্‌ছে—তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ প্রদেশদ্বারে বাঙালির ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে মর্‌ছে। বস্তুত ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি, তার দিকে বাঙালির উদ্বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকল রকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন কর্‌বার জন্য বাঙালিই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল, তখন বাঙালির মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠ্‌ল—সেটা হচ্চে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ কর্‌বার পক্ষে বাঙালির মনে সকলের চেয়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা যে সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এই জন্যই সেটা এমন সুতীব্র—সেটা ব্যাধির প্রকোপের মতো পীড়ার দ্বারা এমন ক'রে আমাদের সচেতন ক'রে তুলেছে।

বাঙালির মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি কর্‌তে পারে না। বিরোধে

দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড়ো বেদনাই আমাদের মনে থাক্, এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে। এই জন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ কর্‌তে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা পূর্ব্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, সে তো শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়—সে হচ্চে জ্ঞানে প্রাণে উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্ম্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ কর্‌তে বসেছে। কিন্তু আমি যতটা দেখেছি, তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্ম্ম-নৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের সে-সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চল্‌তে থাকে, যে সাধনা কেবলমাত্র সামজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম ক'রে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে,—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানীর সভ্যতার সৌধ এক মহলা—সেই হচ্চে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারের সব চেয়ে বড়ো জিনিষ যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্চে কৃতকর্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ

থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে ; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান ভালো ক'রে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্ম্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্ম্মটা কী। কিছু দিন এমনও তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করেছে, সেই ধর্ম্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েছে—অতএব খৃষ্টানীকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খৃষ্টানধর্ম্ম স্বভাব-দুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তা বীরের ধর্ম্ম নয়। য়ুরোপ বলতে সুরু করেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্ম্মে তাদেরই সুবিধা ; সংসারে যারা জয়শীল, সে ধর্ম্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। এই অবজ্ঞা আর কোনো দেশে চলতে পারত না ; কিন্তু জাপানে চলতে পারছে, তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না, এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব্ব বোধ করছে—সে জানছে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্ত্তৃপক্ষরা যে-ধর্ম্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে হচ্চে শিন্তো ধর্ম্ম। তার কারণ এই ধর্ম্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক ; আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম্ম রাজাকে এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের দেবতা ব'লে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র ক'রে তোলবার উপায়-রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহাল নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom

of Heavenকে স্বীকার ক'রে আস্‌ছে। সেখানে নম্র যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। কৃতকর্ম্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক্, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিৎ,—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পার্‌বে না—শেষ পর্য্যন্তই এ টিঁকে থাক্‌বে, এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখ্‌তে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর্‌বার কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্চে।

পারস্যে

পারস্যে

১

১১ এপ্রেল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির ক'রে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হোলো এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্ত্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি। বোম্বাই থেকে আমার পারসী বন্ধু দিনশা ইরাণী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর থেকে তিনিও হবেন আমার সঙ্গী। তা ছাড়া খবর দিলেন যে, বোম্বাইয়ের পারসিক কন্সাল কেহান সাহেব পারসিক সরকারের পক্ষ থেকে আমার যাত্রার সাহচর্য্য ও ব্যবস্থার ভার পেয়েছেন।

এর পরে ভীরুতা করতে লজ্জা বোধ হোলো। রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না ব'লে ওলন্দাজদের বায়ুপথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হোলো। কথা রইল আমার শুশ্রূষার জন্যে বউমা যাবেন সঙ্গে, আর যাবেন কর্ম্মসহায়রূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী। এক বায়ুযানে চারজনের জায়গা হবে না ব'লে কেদারনাথ এক সপ্তাহ আগেই শূন্যপথে রওনা হয়ে গেলেন।

পূর্ব্বে আর একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে ধরাতল ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল স্থল আমাকে পিছু ডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলা দেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে।

কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ অন্ধকারের নিচে দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছলছল করছে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপুরি গাছের ডাল দুলছে বাতাসে, লতাপাতা ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিঃশ্বাসে একটা শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত। নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে মোটর চল্‌ল। কোথাও বা দাগধরা পুরোনো পাকা দালান,তার খানিকটা ভেঙেপড়া ; আধা-শহুরে দোকানে দ্বার বন্ধ ; শিবমন্দির জনশূন্য, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পোড়ো জমি ; পানাপুকুর ; ঝোপঝাড়। পাখীদের বাসায় তখনো সাড়া পড়ে নি, জোয়ার ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মতো পল্লীর জীবনযাত্রা ভোরবেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে।

গলির মোড়ে নিষুপ্ত বারান্দায় খাটিয়া-পাতা পুলিসথানার পাশ দিয়ে মোটর পৌঁছল বড়ো রাস্তায়। অমনি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে দিয়ে ধূলো উঠল জেগে, গাড়ির পেট্রোল বাষ্পের সঙ্গে তার সগোত্র আত্মীয়তা। কেবল অন্ধকারের মধ্যে দুই সারি বনস্পতি পুঞ্জিত পল্লবস্তবকে প্রাচীন কালের নীরব সাক্ষ্য নিয়ে স্তম্ভিত, সেই যে-কালে শতাব্দীপর্য্যায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার ছায়াস্নিগ্ধ অঙ্গন পার্শ্বে অতীত যুগের ইতিহাসধারা কখনো মন্দ গম্ভীর গতিতে কখনো ঘূর্ণাবর্ত্তসঙ্কুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল। রাজপরম্পরার পদচিহ্নিত এই পথে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ভীষণ বর্গী, কখনো কোম্পানির সেপাই ধূলোর ভাষায় রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে যাত্রা করেছে। তখন ছিল হাতী, উট, তাঞ্জাম, ঘোড়সওয়ারদের অলঙ্কৃত ঘোড়া, রাজপ্রতাপের সেই সব বিচিত্রবাহন ধূলোর ধূসর অন্তরালে মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে। একমাত্র বাকী আছে সর্ব্বজনের ভারবাহিনী করুণ মন্থর গরুর গাড়ি।

দম্‌দম্‌-এ উড়ো জাহাজের আড্ডা ঐ দেখা যায়। প্রকাণ্ড তা'র

কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনো রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার। সেই প্রদোষের অস্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মতো বন্ধু-বান্ধব ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল।

সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে ধূলো উড়িয়ে হাওয়া আলোড়িত ক'রে ঘর্ঘর গর্জ্জনে যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চ'ড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে ক'রে চামড়ার দোলাওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে ব্যবহার্য্য সামগ্রীর হাল্কা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা।

ব্যোমতরী বাংলা দেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চল্‌ল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানা'পুকুরের চারিধারে সংসক্ত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্ত্তি দেখা যায় ছাড়া-ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষাসন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্ম্মল নিরাময় জলগণ্ডুষের জন্যে ইন্দ্রদেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর কারো 'পরে এই বহু কোটি লোকের যথোচিত ভরসা নেই।

মানুষ পশু পাখী কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠছে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলো আঁচড়ে এসে ঠেকল। বিস্মৃতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে, তা'র রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না।

প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনের জানালা দিয়ে দেখি নিচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসছে ভূমিতলটা। খেচর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চারদিক ধূ ধূ করছে। রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হোলো না। কোম্পানীর একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী আমার ফোটো তুলে নিলে। তার পরে খাতায় দু-চার লাইন স্বাক্ষরের দাবি করল যখন, আমার হাসি পেল। আমার মনের মধ্যে তখন শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গরের শ্লোক গুঞ্জরিত। ঊর্দ্ধ থেকে এই কিছু আগেই চোখে পড়েছে নির্জ্জীব ধূলিপটের উপর অদৃশ্য জীবলোকের গোটাকতক স্বাক্ষরের আঁচড়। যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্ত্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে-ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা; কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত; স্বয়ং ইতিবৃত্তবিৎ চিরকালের ছুটিতে অনুপস্থিত; রিসার্চ বিভাগের ভিৎটা-সুদ্ধ তলিয়ে গেছে মাটির নিচে।

এইখানে যন্ত্রটা পেটভ'রে তৈল পান ক'রে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশ-যাত্রা সুরু। এতক্ষণ পর্য্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তা'র পাখার দুঃসহ গর্জ্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি মেনিলা দ্বীপে আখের ক্ষেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটোনো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্ছেন, ক্ষণে ক্ষণে চলেছে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল; কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ

ক'রে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন ক'রে পড়ছেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্র-হুঙ্কারের তুফানে কথাবার্ত্তা যায় তলিয়ে। এক কোণে বেতারবার্ত্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন বাকী তিনজন পালাক্রমে তরি-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌তর লেখা, কিছু বা আহার, কিছু বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুকরো সজনতা নিচের পৃথিবী থেকে ছিটকে প'ড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়।

জাহাজ ক্রমে উর্দ্ধতর আকাশে চড়ছে, হাওয়া চঞ্চল, তরি টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত ক'রে এল। নিচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখাজালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবা-ভূমির নির্জ্জলা একাদশীর চেহারা।

অবশেষে অপরাহ্ণে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্র-পাখীর হাঁ করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুন্‌বার মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, তখনই নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে। শরীরে তখন প্রাণধারণের উপযুক্ত শক্তি কিছু ছিল, কিন্তু সামাজিকতার উপযোগী উদ্‌বৃত্ত ছিল না বললেই হয়। কষ্টে কর্ত্তব্য সেরে হোটেলে এলুম।

হোটেলটি বায়ুতরিযাত্রীর জন্যে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেখা করতে এলেন। তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত। মহারাজ স্বয়ং উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। তা'র যত রকম দুঃসাহসী কৌশল আছে প্রায় সমস্তই তাঁর অভ্যস্ত।

পরের দিন ১২ই এপ্রেল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হোলো। হাওয়ার গতিক পূর্ব্ব দিনের চেয়ে ভালোই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে

মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌছনো গেল। সেখানে বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ক অন্ন ভোগ ক'রে আধঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ-দিকে নীল জল, দক্ষিণে পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তা'র একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়ফড়ানি। বহুদূর নিচে সমুদ্রে ফেনার শাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্চে। তা'র না-শুনি গর্জ্জন, না-দেখি তরঙ্গের উত্তালতা।

এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্ণর বেতারে দূরলিপিযোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্ক-এ পৌঁছল। সমুদ্রতীরে মরুভূমিতে এই সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপ্টা-ছাদের ছোটো ছোটো বাড়ি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্ধুক।

আকাশযাত্রীদের পান্থশালায় আশ্রয় নিলুম। রিক্ত এই ভূখণ্ডে নীলাম্বুচুম্বিত বালুরাশির মধ্যে বৈচিত্র্যসম্পদ কিছুই নেই। সেই জন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরীব মাটির 'পরে। কী সুগম্ভীর সূর্য্যাস্ত, কী তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা। স্নান ক'রে এসে বারান্দায় বসলুম, স্নিগ্ধ বসন্তের হাওয়ায় ক্লান্ত শরীরকে নিবিড় আরামে বেষ্টন ক'রে ধরলে।

এখানকার রাজকর্ম্মচারীর দল সম্মান-সম্ভাষণের জন্যে এলেন। বাইরে বালুতটে আমাদের চৌকি পড়েছে। যে দুই একজন ইংরেজী জানেন তাঁদের সঙ্গে কথা হোলো। বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ ক'রে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত।

প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের আবর্জ্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানব-সম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে, হয় বর্ত্তমান কালের শিক্ষা নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।

এখানে পরধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি কী রকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্ব্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্ত্তমান রাজার শাসনে পরধর্ম্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে, সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্ম্মহিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে,— অনতিকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজকমণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্ব্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্ম্মপ্রচারক, কোরাণপাঠক, সৈয়দ,—এরা সকলেই মোল্লাদের মতো পাগড়ী ও সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সঙ্কুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশী মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস ক'রে অথবা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সম্মতি অনুসারে তবেই এই সাজধারণের অধিকার পাওয়া যায়। এই আইনের তাড়নায় শতকরা নব্বই সংখ্যক মানুষের মোল্লার বেশ ঘুচে

গেছে। লেখক বলেন,—Such were the resu.ts of the contact of Persia with the Western world. They could not have been attained without the leadership of Reza Shah Pehlevi, the greatest man that Persia has produced for many centuries.

অন্তত একবার কল্পনা ক'রে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক ব'লে গণ্য হয়েছে। কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি—কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরও অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার ক'রে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরীক্ষিত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্চে বিনা বিচারে এবং উপবাসপীড়িত দেশের অন্নমুষ্টি অনায়াসে ব্যয়িত হয়ে যাচ্চে, যার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে প্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই। সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হয় তাহোলে সাজ পরবার বা নাম নেবার দরকার নেই, এমন কি, নিলে ক্ষতির কারণ আছে, যদি অন্যের জন্য হয় তাহোলে যথোচিত পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্ম্মকে যদি জীবিকা, এমন কি, লোকমান্যতার বিষয় করা যায়, যদি বিশেষ বেশ বা বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্ম্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার করবার অধিকার আত্মসম্মানের জন্য সমাজের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য একথা মানতেই হবে।

পরদিন তিনটে রাত্রে উঠতে হোলো, চারটের সময় যাত্রা। ১৩ই মে তারিখে সকাল সাড়ে আটটার সময় বুশেয়ারে পৌঁছনো গেল।

বুশেয়ারের গভর্ণর আমাদের আতিথ্যভার নিয়েছেন। যত্নের সীমা নেই।

মাটির মানুষের সঙ্গে আকাশের অন্তরঙ্গ পরিচয় হোলো, মনটা কী বললে এই অবকাশে লিখে রাখি।

ছেলেবেলা থেকে আকাশে যে-সব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা। তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর রৌদ্রে চিলের ওড়া চেয়ে চেয়ে দেখতেম, মনে হোত দরকার আছে ব'লে উড়ছে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দবিস্তার ক'রে চলেছে। সেই আনন্দের প্রকাশ কেবল যে পাখার গতিসৌন্দর্য্যে তা নয়, তার রূপসৌন্দর্য্যে। নৌকোর পালটাকে বাতাসের মেজাজের সঙ্গে মানান রেখে চলতে হয়, সেই ছন্দ রাখবার খাতিরে পাল দেখতে হয়েছে সুন্দর। পাখীর পাখাও বাতাসের সঙ্গে মিল ক'রে চলে, তাই এমন তার সুষমা। আবার সেই পাখায় রঙের সামঞ্জস্যও কত। এই তো হোলো প্রাণীর কথা, তারপরে মেঘের লীলা,—সূর্য্যের আলো থেকে কত রকম রং ছেঁকে নিয়ে আকাশে বানায় খেয়ালের খেলাঘর। মাটির পৃথিবীতে চলায় ফেরায় দ্বন্দ্বের চেহারা, সেখানে ভাবের রাজত্ব, সকল কাজেই বোঝা ঠেলতে হয়। বায়ুলোকে এতকাল যা আমাদের মন ভুলিয়েছে, সে হচ্চে ভারের অভাব, সুন্দরের সহজ সঞ্চরণ।

এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরলো সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল ক'রে নয়, বাতাসকে পীড়িত ক'রে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখীর গান নেই, জন্তুর গর্জ্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় ক'রে আজ চীৎকার করছে।

সূর্য্য উঠল দিগন্তরেখার উপরে। উদ্ধত যন্ত্রটা অরুণরাগের সঙ্গে আপন মিল করবার চেষ্টা মাত্র করেনি। আকাশ-নীলিমার সঙ্গে ওর অসবর্ণতা বেসুরো, অন্তরীক্ষের রঙমহলে মেঘের সঙ্গে ওর অমানান রয়ে গেল। আধুনিক যুগের দূত, ওর সেণ্টিমেণ্টের বালাই নেই, শোভাকে ও অবজ্ঞা করে, অনাবশ্যককে কনুয়ের ধাক্কা মেরে চলে যায়। যখন পূর্ব্বদিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল, পশ্চিমদিগন্তে যখন কোমল নীলের উপর শুক্তিশুভ্র আলো, তখন তার মধ্য দিয়ে ঐ যন্ত্রটা প্রকাণ্ড একটা কালো তেলাপোকার মতো ভন্ ভন্ ক'রে উড়ে চলল।

বায়ুতরি যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সঙ্কীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠ ভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে-পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত ক'রে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব, তা হয়ে এল এক আয়তনের ছবি। সংহত দেশ কালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দ্দিষ্ট হোতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হোলো অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হোলো, এমন অবস্থায় আকাশ-যানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেন-না, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে-বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জ্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে

গেল সেখান থেকে দেখ্‌লে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্ব-নির্ম্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্য-নীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্ম্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

বগ্‌দাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্দ্ধলোক থেকে মার খাচ্চে, এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট ক'রে দেয় ব'লেই তাদের মারা এত সহজ। খৃষ্ট এই সব মানুষকেও পিতার সন্তান ব'লে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের, সেই জন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খৃষ্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মার-ওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানব-সত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।

ইরাক বায়ুফৌজের ধর্ম্মযাজক তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে আমার কাছে বাণী চাইলেন, আমি যে-বাণী পাঠালুম সেইটে এইখানে প্রকাশ করা যাক,—

From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of purity surrounding him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down upon the world of Man for whom God feels ashamed.

নিকটের থেকে আমাদের চোখ যতটা দূরকে একদৃষ্টিতে দেখতে পায়, উপরের থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক দেশকে দেখে। এই জন্যে বায়ুতরি যখন মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ বেগে ছুটছে তখন নিচের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না তার চলন এত দ্রুত। বহু দূরত্ব আমাদের চোখে সংহত হয়ে ছোটো হয়ে গেছে ব'লেই সময় পরিমাণও

আমাদের মনে ঠিক থাকল না। দুইয়ে মিলে আমাদের কাছে বাস্তবের যে প্রতীতি জন্মাচ্চে সেটা আমাদের সহজ বোধের থেকে অনেক তফাৎ। জগতের এই যন্ত্র-পরিমাপ যদি আমাদের সহজ পরিমাপ হোত তাহোলে আমরা একটা ভিন্ন জগতে বাস করতুম। তাই ভাবছিলুম সৃষ্টিটা ছন্দের লীলা। যে-তালের লয়ে আমরা এই জগৎকে অনুভব করি সেই লয়টাকে দুনের দিকে বিলম্বিতের দিকে বদলে দিলেই সেটা আর এক সৃষ্টি হবে। অসংখ্য অদৃশ্য রশ্মিতে আমরা বেষ্টিত। আমাদের স্নায়ুস্পন্দনের ছন্দ তাদের স্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না ব'লে তা'রা আমাদের অগোচর। কী ক'রে বল্‌ব এই মুহূর্তেই আমাদের চারদিকে ভিন্ন লয়ের এমন অসংখ্য জগৎ নেই যারা পরস্পরের অপ্রত্যক্ষ। সেখানকার মন আপন বোধের ছন্দ অনুসারে যা দেখে যা জানে যা পায় সে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য, বিভিন্ন মনের যন্ত্রে বিশ্বের বিভিন্ন বাণী এক সঙ্গে উদ্ভূত হচ্চে সীমাহীন অজানার অভিমুখে।

এই ব্যোমবাহনে চ'ড়ে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ বোধ না ক'রে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য্য এই যন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ব্যবহারের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে, সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্ত্ত্যের দুষ্মন্তেরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন, আমারও সেই দশা। একালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর এক জাত। শুধু যদি বুদ্ধির জোর এতে প্রকাশ হোত তাহোলে কথা ছিল না। কিন্তু চরিত্রের জোর—সেটাই সব চেয়ে শ্লাঘনীয়। এর পিছনে দুর্দ্দম সাহস, অপরাজেয় অধ্যবসায়। কত ব্যর্থতা, কত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ'কে ক্রমে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে হচ্চে, তবু এরা পরাভব মানছে না। এখানে সেলাম করতেই হবে।

এই ব্যোমতরির চারজন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্ত্তিমান উদ্যম! যে-আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করে নি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধ'রে প্রভূত বলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পূরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত। মনেপ্রাণে সাধনা ক'রে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি,—কিন্তু আমাদের মন যদি বা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। আজ পশ্চিম মহাদেশে অন্নাভাবের সমস্যা মেটাবার দুশ্চিন্তায় রাজকোষ থেকে টাকা ফেলে দিচ্চে। কেননা, পর্য্যাপ্ত অন্নের জোরেই সভ্যতার আন্তরিক বাহ্যিক সব রকম কল পুরোদমে চলে। আমাদের দেশে সেই অন্নের চিন্তা ব্যক্তিগত, সে-চিন্তার শুধু যে জোর নেই তা নয়, সে বাধাগ্রস্ত। ওদের দেশে সে-চিন্তা রাষ্ট্রগত, সেদিকে সমস্ত জাতির সাধনার পথ স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত, এমন কি, নিষ্ঠুর অন্যায়ের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হতে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ অশন তত নয়।

২

মহামানব জাগেন যুগে যুগে ঠাঁই বদল ক'রে। একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধ'রে এসিয়ায় ছিল। তখন এখানেই

ঘটেছে মানুষের নব নব ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে। আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে। আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদ-প্রধান ব'লে খর্ব্ব করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো জাত মহত্ত্বে পৌঁছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চ'ড়ে। বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্চে বিশুদ্ধ বর্ব্বর। সেই মানুষই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী, সত্যকে যে শ্রদ্ধা ক'রে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্য-সাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করেছে তাদের। পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য মহাদেশেই মানুষ আজ উজ্জ্বল তেজে প্রকাশমান।

সচল প্রাণের শক্তি যত দুর্ব্বল হয়ে আসে দেহের জড়ত্ব ততই নানা আকারে উৎকট হয়ে ওঠে। একদিন ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে এসিয়ার চিত্ত প্রাণবান ছিল, সেই প্রাণধর্ম্মের প্রভাবে তার আত্মসৃষ্টি বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ত। তার শক্তি যখন ক্লান্ত ও সুপ্তিমগ্ন হোলো, তার সৃষ্টির কাজ যখন হোলো বন্ধ, তখন তার ধর্ম্মকর্ম্ম অভ্যস্ত আচারের যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে নিরর্থক হয়ে উঠ্‌ল। এ'কেই বলে জড়তত্ত্ব, এতেই মানুষের সকল দিকে পরাভব ঘটায়।

অপর পক্ষে পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে বিপদের লক্ষণ আজ যা দেখা দিয়েছে সেও একই কারণে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেছে, এই প্রভাব সত্যের বরদান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কলুষিত হোলেই সত্য তাকে ফিরে মারে। বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন ক'রে লাগামে বাঁধছে। তাতে ক'রে লোভের শক্তি হয়ে উঠ্‌ছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠ্‌ছে বিরাট। যে ঈর্ষা হিংসা মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী ক'রে তুল্‌ছে তাতে

ক'রে য়ুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আজ বিষজীর্ণ। প্রবৃত্তির প্রাবল্যও মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়। এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়, এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি। বাঁধন-খোলা উন্মত্ত যখন আত্মঘাত করে তখন মুক্তিই তার কারণ নয় তার কারণ মত্ততা।

বয়স যখন অল্প ছিল তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীর আনন্দের সঙ্গে পড়েছি, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ সত্য আলোচনা ক'রে তার সাধকের পরে ভক্তি হয়েছে মনে। এর ভিতর দিয়ে মানুষের যে-পরিচয় আজ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়েছে তার মধ্যেই তো শাশ্বত মানুষের প্রকাশ। এই প্রকাশকে লোভান্ধ মানুষ অবমানিত করতে পারে। সেই পাপে হীন-মতি নিজেকেই সে নষ্ট করবে কিন্তু মহৎকে নষ্ট করতে পারবে না। সেই মহৎ সেই জাগ্রৎ মানুষকে দেখ্‌ব ব'লেই একদিন ঘরের থেকে দূরে বেরিয়েছিলুম, য়ুরোপে গিয়েছিলুম ১৯১২ খৃষ্টাব্দে।

এই যাত্রাকে শুভ ব'লেই গণ্য করি। কেননা আমরা এসিয়ার লোক, য়ুরোপের বিরুদ্ধে নালিশ আমাদের রক্তে। যখন থেকে তাদের জলদস্যু ও স্থলদস্যু দুর্ব্বল মহাদেশের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়েছে সেই আঠারো শতাব্দী থেকে আমাদের কাছে এরা নিজেদের মানহানি করেছে। লজ্জা নেই, কেননা এরা আমাদের লজ্জা করবার যোগ্য ব'লেও মনে করে নি। কিন্তু য়ুরোপে এসে একটা কথা আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, সহজ মানুষ আর নেশন এক জাতের লোক নয়। যেন সহজ শরীর এবং বর্ম্ম-পরা শরীরের ধর্ম্মই স্বতন্ত্র। একটাতে প্রাণের স্বভাব প্রকাশ পায় আর একটাতে দেহটা যন্ত্রের অনুকরণ করে। দেখ্‌লুম সহজ মানুষকে আপন মনে করতে কোথাও বাধে না, তার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা দেয় কখনো তা রমণীয় কখনো বা বরণীয়। আমি তাকে

ভালোবেসেছি শ্রদ্ধা করেছি, ফিরেও পেয়েছি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। বিদেশে অপরিচিত মানুষের মধ্যে চিরকালের মানুষকে এমন স্পষ্ট দেখা দুর্লভ সৌভাগ্য।

কিন্তু সেই কারণেই একটা কথা মনে ক'রে বেদনা বোধ করি। যে দেশে বহুসংখ্যক লোকের মন পলিটিক্সের যন্ত্রটার মধ্যেই পাক খেয়ে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা যন্ত্রের ছাঁদে পাকা হয়ে ওঠে। কাজ উদ্ধার করবার নৈপুণ্য একান্ত লক্ষ্য হয়। এ'কেই বলে যান্ত্রিক জড়তা, কেননা যন্ত্রের চরম সার্থক্য কাজের সাফল্যে। পাশ্চাত্য দেশে মানব-চরিত্রে এই যান্ত্রিক বিকার ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে এটা লক্ষ্য না ক'রে থাকা যায় না। মানুষ-যন্ত্রের কল্যাণবুদ্ধি অসাড় হয়ে আস্‌ছে তার প্রমাণ পূর্ব্বদেশে আমাদের কাছে আর ঢাকা রইল না। মনে পড়ছে ইরাক-এ একজন সম্মানযোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ইংরাজজাতের সম্বন্ধে আপনার কী বিচার?" আমি বল্‌লেম, "তাঁদের মধ্যে যাঁরা best তাঁরা মানবজাতির মধ্যে best." তিনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর যারা next best?" চুপ ক'রে রইলুম। উত্তর দিতে হোলে অসংযত ভাষার আশঙ্কা ছিল। এসিয়ার অধিকাংশ কারবার এই next best এর সঙ্গেই। তাদের সংখ্যা বেশি, প্রভাব বেশি, তাদের স্মৃতি বহুব্যাপক লোকের মনের মধ্যে চিরমুদ্রিত হয়ে থাকে। তাদের সহজ মানুষের স্বভাব আমাদের জন্যে নয়, এবং সে স্বভাব তাদের নিজেদের জন্যেও ক্রমে দুর্লভ হয়ে আস্‌ছে।

দেশে ফিরে এলুম। তার অনতিকালের মধ্যেই য়ুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করছে মানুষের মহা সর্ব্বনাশের কাজে। এই সর্ব্বনাশা বুদ্ধি যে-আগুন দেশে দেশে লাগিয়ে দিল তার শিখা মরেছে কিন্তু তার পোড়া কয়লার আগুন এখনো

মরেনি। এত বড়ো বিরাট দুর্য্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয়নি। এ'কেই বলি জড়তত্ত্ব, এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত, বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

ইতিমধ্যে দেখা যায় এসিয়ার নাড়ী হয়েছে চঞ্চল। তার কারণ য়ুরোপের চাপটা তার বাইরে থাক্‌লেও তার মনের উপর থেকে সেটা সরে গেছে। একদিন মার খেতে খেতেও য়ুরোপকে সে সর্ব্বতোভাবে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে ধরে নিয়েছিল। আজ এসিয়ার এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোথাও তার মনে আর শ্রদ্ধা নেই। য়ুরোপের হিংস্রশক্তি যদিও আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে তৎসত্ত্বেও এসিয়ার মন থেকে আজ সেই ভয় ঘুচে গেছে যার সঙ্গে সম্ভ্রম মিশ্রিত ছিল। য়ুরোপের কাছে অগৌরব স্বীকার করা তার পক্ষে আজ অসম্ভব কেননা য়ুরোপের গৌরব তার মনে আজ অতি ক্ষীণ। সর্ব্বত্রই সে ঈষৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করুছে, "But the next best ?"

আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পট পরিবর্ত্তন হচ্চে। এসিয়ায় নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরিশিখরে এই নব প্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিষ বটে—এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

আমি এই কথা বলি, এসিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হোলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এসিয়ার দুর্ব্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এসিয়ার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ-রাঙারাঙি, তার মিথ্যা-কলঙ্কিত কূট কৌশলের গুপ্তচরবৃত্তি। ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ছে

সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত ক'রে অবশেষে আজ অগাধ ধন-সমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ ক'রে তুল্‌ছে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।

নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব্ব এসিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এসিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়েছে, লঘু ক'রে দিয়েছে এসিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হোলো। দেখ্‌লুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত ক'রে একদিকে নিরাপদ হয়েছে তেমনি অন্যদিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজম, সে নিজের চারদিকে মথিত ক'রে তুলছে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করবার নয়, আর এই জ্বালায় ভাবী কালের অগ্নিকাণ্ড কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। ইতিহাসে ভাগ্যের অনুকূল হাওয়া নিরন্তর বয় না। এমন দিন আস্‌বেই যখন আজ যে দুর্ব্বল তারই কাছে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গ'ণে দিতে হবে। কী ক'রে মিলতে হয় জাপান তা শিখ্‌ল না, কী ক'রে মার্‌তে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।

কিন্তু এতে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবের ভুল হোলো ব'লেই এটা শোচনীয় এমন কথা আমি বলিনে। আমি এই বল্‌তে চাই এসিয়ায় যদি নতুন যুগ এসেই থাকে তবে এসিয়া তাকে নতুন ক'রে আপন ভাষা দিক্। তা না ক'রে য়ুরোপের পশুগর্জ্জনের অনুকরণই যদি সে করে সেটা সিংহনাদ হোলেও তার হার। ধার-করা রাস্তা যদি গর্ত্তের দিকে যাবার রাস্তা হয় তাহোলে তার লজ্জা দ্বিগুণ মাত্রায়। যা হোক্ এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত যে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠ্‌ছে তার খবর দূর থেকে শোনা যায়। যখন

ভাবছিলুম তুরুস্ক এবার ডুবল তখন হঠাৎ দেখা দিলেন কামালপাশা। তখন তাঁদের বড়ো সাম্রাজ্যের জোড়াতাড়া অংশগুলো যুদ্ধের ধাক্কায় গেছে ভেঙে। সেটা শাপে বর হয়েছিল। শক্ত ক'রে নতুন ক'রে রাজ্যটাকে তার স্বাভাবিক ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গড়ে তোলা সহজ হোলো ছোটো পরিধির মধ্যে। সাম্রাজ্য বল্‌তে বোঝায় যারা আত্মীয় নয় তাদের অনেককে এক দড়ির বাঁধনে বেঁধে কলেবরটাকে অস্বাভাবিক স্থূল ক'রে তোলা। দুঃসময়ে বাঁধন যখন ঢিলে হয় তখন ঐ অনাত্মীয়ের সংঘাত বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য হোতে থাকে। তুরুস্ক হাল্‌কা হয়ে গিয়েই যথার্থ আঁট হয়ে উঠ্‌ল। তখন ইংলণ্ড তাকে তাড়া করেছে গ্রীস্‌কে তার উপরে লেলিয়ে দিয়ে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতক্তে তখন বসে আছেন লয়েড জর্জ্জ ও চার্চ্চহিল্‌। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তখনকার মিত্রশক্তিরা একটা সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় আঙ্গোরার প্রতিনিধি বেকির সামী তুরুস্কের হয়ে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অনেকটা পরিমাণে ত্যাগ কর্‌তেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রীস্‌ আপন ষোলো আনা দাবীর পরেই জেদ ধরে ব'সে রইল, ইংলণ্ড পশ্চাৎ থেকে তার সমর্থন কর্‌লে। অর্থাৎ কালনেমি মামার লঙ্কাভাগের উৎসাহ তখনো খুব ঝাঁঝালো ছিল।

এই গোলমালের সময় তুরুস্ক মৈত্রী বিস্তার কর্‌লে ফ্রান্সের সঙ্গে। পারস্য এবং আফগানিস্থানের সঙ্গেও তার বোঝাপড়া হয়ে গেল। আফগানিস্থানের সন্ধিপত্রের দ্বিতীয় দফায় লেখা আছে।

"The contracting parties recognize the emancipation of the nations of the East and confirm the fact of their unrestricted freedom, their right to be independent

and to govern themselves in whatever manner they themselves choose."

এদিকে চলল গ্রীস্ তুরুষ্কের লড়াই। এখনো আঙ্গোরাপক্ষ রক্তপাত নিবারণের উদ্দেশে বারবার সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে। কিন্তু ইংলণ্ড ও গ্রীস্ তার বিরুদ্ধে অবিচলিত রইল। শেষে সকল কথাবার্ত্তা থাম্‌ল গ্রীসের পরাজয়ে। কামালপাশার নায়কতায় নূতন তুরস্কের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোলো আঙ্গোরা রাজধানীতে।

নব তুরুষ্ক একদিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত কর্‌লে আর একদিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ কর্‌লে অন্তরে বাহিরে। কামাল-পাশা বল্‌লেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরুষ্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধুনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তি তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এই মোহমুক্ত চিত্তই বিশ্বে আজ বিজয়ী। পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা কর্‌তে হোলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন সকলের আগে চাই। তুরুষ্কের বিচারবিভাগের মন্ত্রী বল্‌লেন, "Mediaeval principles must give way to secular laws. We are creating a modern, civilised nation, and we desire to meet contemporary needs. We have the will to live, and nobody can prevent us." এই পরিপূর্ণভাবে বুদ্ধিসঙ্গতভাবে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের বাধা দেয় মধ্যযুগের পৌরাণিক অন্ধ সংস্কার। আধুনিক লোকব্যবহারে তার প্রতি নির্ম্মম হোতে হবে এই তাঁদের ঘোষণা।

যুদ্ধজয়ের পরে কামালপাশা যখন স্মির্ণা সহরে প্রবেশ কর্‌লেন সেখানে একটি সর্ব্বজন-সভা ডেকে মেয়েদের উদ্দেশে বল্‌লেন, "যুদ্ধে আমরা নিঃসংশয়িত জয়সাধন করেছি কিন্তু সে জয় নিরর্থক হবে যদি

তোমরা আমাদের আনুকূল্য না করো। শিক্ষার জয়সাধন করো তোমরা, তাহোলে আমরা যতটুকু করেছি তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারবে। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি আধুনিক প্রাণযাত্রার পথে তোমরা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর না হও। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি তোমরা গ্রহণ না করো আধুনিক জীবননির্ব্বাহ-নীতি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে।"

এ যুগে য়ুরোপ সত্যের একটি বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। সেই সাধনার ফল সকল কালের সকল মানুষের জন্যেই, তাকে যে না গ্রহণ করবে সে নিজেকে বঞ্চিত করবে। এই কথা এসিয়ার পূর্ব্বতম-প্রান্তে জাপান স্বীকার করেছে এবং পশ্চিমতম প্রান্তে স্বীকার করেছে তুরুষ্ক। ভৌতিক জগতের প্রতি সত্য ব্যবহার করা চাই এই অনুশাসন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের, না করলেই বুদ্ধিতে এবং সংসারে আমরা ঠকব। এই সত্য ব্যবহার করার সোপান হচ্চে মনকে সংস্কারমুক্ত ক'রে বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত ভৌতিক তত্ত্বগুলি উদ্ধার করা।

কথাটা সত্য। কিন্তু আরো চিন্তা করবার বিষয় আছে। য়ুরোপ যেখানে সিদ্ধিলাভ করেছে সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে অনেকদিন থেকে, সেখানে তার ঐশ্বর্য্য বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর। যেখানে করেনি, সে জায়গাটা গভীরে, মূলে, তাই সেটা অনেককাল থেকে প্রচ্ছন্ন রইল। এইখানে সে বিশ্বের নিদারুণ ক্ষতি করেছে এবং সেই ক্ষতি ক্রমেই ফিরে আসছে তার নিজের অভিমুখে। তার যে-লোভ চীনকে আফিম খাইয়েছে সে লোভ তো চীনের মরণের মধ্যেই মরে না। সেই নির্দ্দয় লোভ প্রত্যহ তার নিজেকে মোহান্ধ করছেই, বাইরে থেকে সেটা আমরা স্পষ্ট দেখি বা না দেখি। কেবল ভৌতিক জগতে নয় মানবজগতেও নিষ্কাম চিত্তে

সত্য ব্যবহার মানুষের আত্মরক্ষার চরম উপায়। সেই সত্য ব্যবহারের সাধনার প্রতি পাশ্চাত্য দেশ প্রতিদিন শ্রদ্ধা হারাচ্চে, তা নিয়ে তার লজ্জাও যাচ্চে চ'লে তাই জটিল হয়ে উঠেছে তার সমস্ত সমস্যা, বিনাশ হয়ে এল আসন্ন। য়ুরোপীয় স্বভাবের অন্ধ অনুবর্ত্তী জাপান সিদ্ধিমদমত্ততায় নিত্যতত্ত্বের কথাটা ভুলেছে তা দেখাই যাচ্চে কিন্তু চিরন্তন শ্রেয়স্তত্ত্ব আপন অমোঘ শাসন ভুলবে না এ কথা নিশ্চিত জেনে রাখা চাই।

নবযুগের আহ্বানে পশ্চিম এসিয়া কী রকম সাড়া দিচ্চে সেটা স্পষ্ট ক'রে জানা ভালো। খুব বড়ো ক'রে সেটা জানবার এখনো সময় হয় নি। এখানে ওখানে একটু একটু লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলো প্রবল ক'রে চোখে পড়বার নয়, কিন্তু সত্য ছোটো হয়েই আসে। সেই সত্য এসিয়ার সেই দুর্ব্বলতাকে আঘাত করতে সুরু করেছে যেখানে অন্ধ সংস্কারে, জড় প্রথায় তার চলাচলের পথ বন্ধ। এ পথ এখনো খোলসা হয় নি কিন্তু দেখা যায় এই দিকে তার মনটা বিচলিত। এসিয়ার নানা দেশেই এমন কথা উঠেছে যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মানবের সকল ক্ষেত্র জুড়ে থাকলে চল্‌বে না। প্যালেষ্টাইন শাসন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে বিদায় ভোজ দেওয়ার সভায় যখন সেই কর্ম্মচারী বল্‌লেন,—

"Palestine is a Mahommedan country, and its government should, therefore, be in the hands of the Mahommedans, on condition that the Jewish and Christian minorities are represented in it." তখন জেরুজিলামের মুফ্‌তি হাজি এমিন এল্‌-হুসেইনি উত্তর করলেন, "For us it is an exclusively Arab, not a Mahommedan question. During your sojourn in this country you have doubtless observed that here there are no distinctions between Mohom-

medan and Christian Arabs. We regard the Christians not as a minority, but as Arabs.

জানি এই উদারবুদ্ধি সকলের, এমন কি, অধিকাংশ লোকের, নেই, তবু সে যে ছোটো বীজের মতো অতি ছোটো জায়গা জুড়েই নিজেকে প্রকাশ করতে চাচ্চে এইটে আশার কথা। বর্তমানে এ ছোটো কিন্তু ভবিষ্যতে এ ছোটো নয়।

আর একটা অখ্যাত কোণে কী ঘটেছে চেয়ে দেখো। রুশীয় তুর্কি-স্থানে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অতি অল্পকালের মধ্যেই এসিয়ার মরুচর জাতির মধ্যে যে নূতন জীবন সঞ্চার করেছে তা আলোচনা ক'রে দেখলে বিস্মিত হোতে হয়। এত দ্রুতবেগে এতটা সফলতা লাভের কারণ এই যে, এদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করতে এদের আত্মশক্তিকে পূর্ণতা দিতে সেখানকার সরকারের পক্ষে অন্তত লোভের স্বতরাং ঈর্ষার বাধা নেই। মরুতলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই সব ছোটো জাতিকে আপন আপন রিপাব্লিক স্থাপন করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন প্রভূত ও বিচিত্র। পূর্ব্বেই অন্যত্র বলেছি বহুজাতি-সঙ্কুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারা-মারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক শাসনে সেটা নিত্যই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয় সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটে না সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়। এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নতুন বর্ষার বন্যাজলের মতো এসিয়ার নদীনালার মধ্যে প্রবেশ করতে সুরু করেছে। তাই বহুযুগ পরে এসিয়ার মানুষ আজ আত্মাবমাননার দুর্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে দাঁড়াল। এই মুক্তি-প্রয়াসের আরম্ভে যতই দুঃখ-যন্ত্রণা থাক্, তবু মনুষ্য-গৌরব লাভের জন্যে এই যে আপন সব কিছু পণ করা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু

নেই। আমাদের এই মুক্তির দ্বারাই সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে। এ-কথা নিশ্চিত মনে রাখতে হবে য়ুরোপ আজ নিজের ঘরে এবং নিজের বাইরে আপন বন্দীদের হাতেই বন্দী।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন য়ুরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি এখানে কেন এসেছ ?" আমি বলেছিলুম, "য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি।" য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলেছে, প্রাণের আলো জ্বলেছে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানাদিকে প্রকাশ করছে।

সেদিন পারস্যেও আমাকে একজন ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন। আমি বলেছিলেম, "পারস্যে যে-মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেছি।" তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলেছে আলো জানি। তাই পারস্য থেকে যখন আহ্বান এল তখন আবার একবার দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মন চঞ্চল হোলো।

রোগ-শয্যা থেকে তখন সবে উঠেছি। ডাক্তারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম না,—সাহস ছিল না,—গরমের দিনে জল স্থলের উপর দিয়ে রৌদ্রের তাপ এবং কলের নাড়া খেতে খেতে দীর্ঘ পথ বেয়ে চলব সে সাহসেরও অভাব ছিল। আকাশযানে উঠে পড়লুম। ঘরের কোণে একলা ব'সে যে বালক দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের আহ্বান শুনতে পেত আজ সেই দূরের আহ্বানে সে সাড়া দিল ঐ আকাশের পথ বেয়েই। পারস্যের দ্বারে এসে নামলুম দুদিন পরেই। তার পরদিন সকালে পৌঁছলুম বুশেয়ার-এ।

৩

বুশেয়ার সমুদ্রের ধারে জাহাজ-ঘাটার সহর। পারস্যের অন্তরঙ্গ স্থান এ নয়।

বৈকালে পারসিক পার্লামেন্টের একজন সদস্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন আমি কী জানতে চাই। বল্‌লুম, পারস্যের শাশ্বত স্বরূপটি জানতে চাই যে-পারস্য আপন প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি বললেন, বড়ো মুস্কিল। সে পারস্য কোথায় কে জানে। এ দেশে এক বৃহৎ দল আছে তারা অশিক্ষিত, পুরোনো তাদের মধ্যে অপভ্রষ্ট, নতুন তাদের মধ্যে অনুদ্গত। শিক্ষিত বিশেষণে যারা খ্যাত তারা আধুনিক, নতুনকে তারা চিনতে আরম্ভ করেছে, পুরোনোকে তারা চেনে না।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, সকলেরই মধ্যে দেশ প্রকাশমান নয়, বহুর মধ্যে সে অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট। দেশের যথার্থ প্রকাশ কোনো কোনো বিশেষ মানুষের জীবনে ও উপলব্ধিতে। দেশের আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা কোন্ ফাটল দিয়ে একটি কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে। যা গভীরের মধ্যে সঞ্চিত তা সর্ব্বত্র বহুলোকের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় না। যা অধিকাংশের আবিল চিত্তের আড়ালে থাকে, তা কারো কারো প্রকৃতিগত মানসিক স্বচ্ছতার কাছে সহজেই অভিব্যক্ত হয়। তাঁর পুঁথিগত শিক্ষা কতদূর, তাঁকে দেশ মানে কি মানে না সে কথা অবান্তর। সে রকম কোনো দৃষ্টিবান লোক পারস্যে নিশ্চয়ই আছে,তারা সম্ভবত নামজাদাদের দলের মধ্যে নয়,এমন কি তারা

বিদেশীদের কেউ হোতেও পারে ; কিন্তু পথিক মানুষ কোথায় তাদের খুঁজে পাবে।

যাঁর বাড়িতে আছি তাঁর নাম মাহ্‌মুদ রেজা। তিনি জমিদার ও ব্যবসায়ী। নিজের ঘর দুয়োর ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য দুঃখ পেয়েছেন কম নয়, নতুন আসবাবপত্র আনিয়ে নিজের অভ্যস্ত আরামের উপকরণকে উল্টোপাল্টা করেছেন। আড়ালে থেকে সমস্তক্ষণ আমাদের প্রয়োজন সাধনে তিনি ব্যস্ত, কিন্তু সর্ব্বদা সমুখে এসে সামাজিকতার অভিঘাতে আমাদের ব্যস্ত করেন না। এঁর বয়স অল্প, শান্ত প্রকৃতি, সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ।

সম্মানের সমারোহ এসে অবধি নানা আকারে চলছে। এই জিনিষটাকে আমার মন সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না, নিজের মধ্যে আমি এর হিসাব মিলিয়ে পাইনে। বুশেয়ারের এই জনতার মধ্যে আমি কেই বা। আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে ভাষায় ভাবে কর্ম্মে আমি যে বহুদূরের অজানা মানুষ। য়ুরোপে যখন গিয়েছি তখন আমার কবির পরিচয় আমার সঙ্গেই ছিল। একটা বিশেষ বিশেষণে তারা আমাকে বিচার করেছে। বিচারের উপকরণ ছিল তাদের হাতে। এরাও আমাকে কবি ব'লে জানে, কিন্তু সে জানা কল্পনায়। এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। অর্থাৎ কবি বলতে সাধারণত এরা যা বোঝে তাই সম্পূর্ণ আমার 'পরে আরোপ করতে এদের বাধেনি। কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। আমার খ্যাতির সাহায্যে সেই মৈত্রী আমি কোনো দান না দিয়েই পেয়েছি। অন্য দেশে সাহিত্যরসিক মহলেই সাহিত্যিকদের আদর, পলিটিশিয়নের দরবারে তার আসন পড়ে না, এখানে সেই গণ্ডি দেখা গেল না। যাঁরা সম্মানের আয়োজন করেছেন তাঁরা প্রধানতঃ রাজদরবারীদের দল। মনে পড়ল ইজিপ্টের কথা।

সেখানে যখন গেলেম রাষ্ট্রনেতারা আমার অভ্যর্থনার জন্যে এলেন। বললেন, এই উপলক্ষে তাঁদের পার্লামেণ্টের সভা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতবি রাখতে হোলো। প্রাচ্যজাতীয়ের মধ্যেই এটা সম্ভব। এদের কাছে আমি শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেই জন্যে এরা অগ্রসর হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা করেছে কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরো একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্য্যঅভিমান-বোধ বরাবর চলে এসেছে, সম্প্রতি সেটা যেন আরো বেশি ক'রে জেগে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তারপরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য। যেখানে পাঠকের কাছে কবিকে নিজের পথ নিজে অবারিত করে যেতে হয় সেখানে ভূমি বন্ধুর। কিন্তু যে দেশে আমার পাঠক নেই এখানে আমি সেই নিরাপদ দেশের কবি—এখানকার বহুকালের সকল কবিরই রাজপথ আমার পথ। আমার প্রীতির দিক থেকেও এরা আমার কাছে এসেছে সহজ মানুষের সম্বন্ধে,—এরা আমার বিচারক নয়, বস্তু যাচাই ক'রে মূল্য দেনা পাওনার কারবার এদের সঙ্গে নেই। কাছের মানুষ ব'লে এরা যখন আমাকে অনুভব করেছে তখন ভুল করেনি এরা, সত্যই সহজেই এদের কাছে এসেছি। বিনা বাধায় এদের কাছে আসা সহজ, সেটা স্পষ্ট অনুভব করা গেল। এরা যে অন্য সমাজের অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, অন্য সমাজগণ্ডীর, সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার মতো কোনো উপলক্ষ্যই আমার গোচর হয়নি। য়ুরোপীয় সভ্যতায় সামাজিক বাঁধা নিয়মের বেড়া, ভারতীয় হিন্দুসভ্যতায় সামাজিক সংস্কারের বেড়া আরো কঠিন; বাংলায় নিজের কোণ থেকে বেরিয়ে পশ্চিমেই যাই,

দক্ষিণেই যাই কারো ঘরের মধ্যে আপন স্থান ক'রে নেওয়া দুঃসাধ্য, পায়ে পায়ে সংস্কার বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়; এমন কি, বাংলার মধ্যেও। এখানে অশনে আসনে ব্যবহারে মানুষে মানুষে সহজেই মিশে যেতে পারে। এরা আতিথেয় ব'লে বিখ্যাত, সে আতিথ্যে পংক্তিভেদ নেই।

১৬ এপ্রেল। সকাল সাতটার সময় শিরাজ অভিমুখে ছাড়বার কথা। শরীর যদিও অসুস্থ ও ক্লান্ত তবু অভ্যাস মতো ভোরে উঠেছি, তখন আর-সকলে শয্যাগত। সকলে মিলে প্রস্তুত হয়ে বেরতে ন'টা পেরিয়ে গেল।

মেঠো রাস্তা। মোটরগাড়ীর চালচলনের সঙ্গে রাস্তাটার ভঙ্গিমার বনিবনাও নেই। সেই অসামঞ্জস্যের ধাক্কা যাত্রীরা প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝেছিল। যাকে বলে হাড়ে-হাড়ে বোঝা।

মাঠের পর মাঠ, তার আর শেষ নেই। কোথাও একটা ঘর বা গাছ বা বসতির চিহ্ন দেখিনে। পারস্যদেশের বেশির ভাগ উচ্চ মালভূমি, পাহাড়ে বেষ্টিত, আবার মাঝে মাঝে গিরিশ্রেণী। এই মালভূমি সমুদ্র-উপরিতল থেকে পাঁচ ছয় হাজার ফিট উঁচু। এর মাঝখানটা নেমে গিয়েছে প্রকাণ্ড এক মরুভূমিতে। এই অধিত্যকায় পাহাড় ডিঙিয়ে মেঘ পৌঁছতে বাধা পায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প। পর্ব্বত থেকে জলস্রোত নেমে মাঝে মাঝে উর্ব্বরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ক্ষীণজল এই স্রোতগুলি সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রায় পৌঁছয় না, মরু নেয় তাদের শুষে কিম্বা জলার মধ্যে তাদের দুর্গতি ঘটে।

বন্ধুর পথে নাড়া খেতে খেতে ক্রমে সেই বিশাল নীরস শূন্যতার মধ্যে দূরে দেখা যায়, খেজুরের কুঞ্জ, কোথাও বা বাব্‌লা। এই জনবিরল জায়গায় দশমাইল অন্তর সশস্ত্র পুলিস পাহারা। পথে পথিক প্রায় দেখিনে। আমাদের দেশ হোলে আর্ত্তনাদমুখর গোরুর গাড়ি দেখা যেত। এদেশে তার জায়গায় পিঠের দুই পাশে বোঝা ঝুলিয়ে গাধা কিম্বা দলবাঁধা খচ্চর

মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল নিয়ে মেষপালক, দুই এক জায়গায় কাঁটা ঝোপের মধ্যে চ'রে বেড়াচ্চে উটের দল।

বেলা যায়, রৌদ্র বেড়ে ওঠে; মোটর-চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলো উড়িয়ে বাতাস বইছে, আমাদের শীতের হাওয়ার মতো ঠাণ্ডা। ক্বচিৎ এক এক জায়গায় দেখি তোরণওয়ালা মাটির ছোটো কেল্লা, সেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। ডান দিগন্তে একটা পাহাড়ের চেহারা ফুটে উঠ্‌ছে, যাত্রা আরম্ভে আকাশের ঘোলা নীলের মধ্যে এ পাহাড় অবগুণ্ঠিত ছিল।

এই অঞ্চলটায় বাষ্‌ক্রি জাতের বাস, তাদের ভাষা তুর্কি। পূর্ব্বতম রাজার আমলে এখানে তাদের বসতি পত্তন হয়। এদের ব্যবসা ছিল দস্যু বৃত্তি। নূতন আমলে এদের ঠাণ্ডা করা হচ্চে। শোনা গেল কিছুদিন আগে পথের মধ্যে এরা একটা সাঁকো ভেঙে রেখেছিল। মালবোঝাই মোটর-বাস্ উল্‌টে পড়তেই খুনজখম লুটপাট করে। এই ঘটনার পরে রাজা তাদের প্রধানের ছেলেকে জামিনস্বরূপে তেহেরানে নিয়ে রেখেছেন। শাস্তিটা কঠোর নয় অথচ কেজো। এই জাতের দলপতি শাকরুল্লা খাঁ তাঁর বসতিগ্রাম থেকে এসে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। আর কয়েক বছর আগে হোলে এই অভিবাদনের ভাষা সম্পূর্ণ অন্যরকম হোত যাকে বলা যেতে পারত মর্ম্মগ্রাহী। বুশেয়ার থেকে বরাবর আমাদের গাড়ির আগে আগে আর একটি মোটরে বন্দুকধারী পাহারা চলেছে। প্রথমে মনে করেছিলুম বুঝিবা এটা রাজকায়দার বাহুল্য অলঙ্কার, এখন বোধ হচ্চে এর একটি জরুরী অর্থ থাকতেও পারে।

মেটে রাস্তা ক্রমে নুড়ি-বিছানো হয়ে এল। বোঝা যায় পাহাড়ের বুকে উঠছি। পথের প্রান্তে কোথাওবা গিরিনদী চলেছে পাথরের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। কিন্তু তারা তো লোকালয়ের ধাত্রীর কাজ করছে

না। মানুষ কোথায়? মাঠে মাঝে মাঝে আকন্দ গাছ কুল গাছ উইলো,—মাঝে মাঝে গমের ক্ষেতে চাষের পরিচয় পাই কিন্তু চাষীর পরিচয় পাইনে।

মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যায়। শিরাজের পথ দীর্ঘ। একদিনে যেতে কষ্ট হবে ব'লে স্থির হয়েছে খাজরুনে গবর্ণরের আতিথ্যে মধ্যাহ্নভোজন সেরে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু বিলম্বে বেরিয়েছি, সময়মতো সেখানে পৌঁছবার আশা নেই, তাই পথে কোনারৃতাখ্‌তে নামে এক জায়গায় প্রহরীদের মেটে আড্ডায় আমাদের মোটর গাড়ি থামল। মাটির মেঝের পরে তাড়াতাড়ি কম্বল কার্পেট বিছিয়ে দিলে। সঙ্গে আহার্য্য ছিল, খেয়ে নিলুম। মনে হোলো, এ যেন বইয়ে পড়া গল্পের পান্থশালা, খেজুরকুঞ্জের মাঝখানে।

এবার পাহাড়ে আঁকাবাঁকা চড়াই পথে উঠেছি। পাহাড়গুলো সম্পূর্ণ টাক-পড়া, এমন কি, পাথরেরও প্রাধান্য কম। বড়ো বড়ো মাটির স্তূপ। যেন মুড়িয়ে দেওয়া দৈত্যের মাথা! বোঝা যায় এটা বৃষ্টি-বিরল দেশ, নইলে গাছের শিকড় যে-মাটিকে বেঁধে রাখেনি বৃষ্টির আঘাতে সে মাটি কতদিন টিঁকতে পারে। স্বল্পপথিক পথে মাঝে মাঝে কেরোসিনের বোঝা নিয়ে গাধা চলেছে। বোঝাইকরা বড়ো বড়ো সরকারী মোটর বাস্ আমাদের পথ বাঁচিয়ে নড়বড় ক'রে ছুটেছে নিচের দিকে। পাহাড়ের পর পাহাড়, তৃণহীন জনহীন রুক্ষ, যেন পৃথিবীর বুক থেকে একটা তৃষার্ত্ত দৈন্যের অশ্রুহীন কান্না ফুলে' ফুলে' উঠে শক্ত হয়ে গেছে।

বেলা যায়। একজায়গায় দেখি পথের মধ্যে খাজরুনের গবর্ণর ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন আমাদের আগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বোঝা গেল তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছেন।

প্রাসাদে পৌঁছলুম। বড়ো বড়ো কমলালেবু গাছের ঘন সংহত

বীথিকা ; স্নিগ্ধচ্ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে দিলে। সেকালের মনোরম বাগান, নাম বাঘ্-ই-নজর। নিঃস্ব রিক্ততার মাঝখানে হঠাৎ এই রকম সবুজ ঐশ্বর্য্যের দানসত্র, এইটেই পারস্যের বিশেষত্ব।

বাগানের তরুতলে আমাদের ভোজের আয়োজন। কিন্তু এখনকার মতো ব্যর্থ হোলো। আমি নিরতিশয় ক্লান্ত। একটি কার্পেট বিছানো ছোটো ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়লুম। বাতাসে তাপ নেই, সামনে খোলা দরজা দিয়ে ঘন সবুজের উচ্ছ্বাস চোখে এসে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে বাগানে গিয়ে দেখি গাছতলায় বড়ো বড়ো ডেকচিতে মোটা মোটা পাচক রান্না চড়িয়েছে, আমাদের দেশে যজ্ঞের রান্নার মতো। বুঝলুম রাত্রিভোজের উদ্যোগপর্ব্ব।

অতিথির সম্মানে আজ এখানে সরকারী ছুটি। সেই সুযোগে অনেকক্ষণ থেকে লোক জমায়েৎ হয়েছিল। আমাদের দেরি হওয়াতে ফিরে গেছে। যাঁরা বাকি আছেন তাঁদের সঙ্গে বসে গেলুম। সকলেরই মুখে তাঁদের রাজার কথা। বললেন, তিনি অসামান্য প্রতিভার জোরে দশ বছরের মধ্যে পারস্যের চেহারা বদলিয়ে দিয়েছেন।

এইখানে আধুনিক পারস্য ইতিহাসের একটুখানি আভাস দেওয়া যেতে পারে।

কাজার জাতীয় আগা মহম্মদখাঁর দানবিক নিষ্ঠুরতায় এই ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায় আরম্ভ হোলো। এরা খাঁটি পারসিক নয়। কাজাররা তুর্কি জাতের লোক। তৈমুরলঙ্গ এদের পারস্যে নিয়ে আসে। বর্ত্তমানে রেজা শা পহ্লবির আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পারস্যের রাজ-সিংহাসন এই জাতীয় রাজাদের হাতেই ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শা নাসির উদ্দিন ছিলেন রাজা। তখন থেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। এই সময়ে পারস্যের মন যে জেগে

উঠেছে তার একটা নিদর্শন দেখা যায় বাবিপন্থীদের ধর্ম্মবিপ্লবে। ঠিক এই সময়েই রামমোহন রায় বাংলাদেশে প্রচার করেছিলেন ধর্ম্মসংস্কার। নাসির উদ্দিন অতি নিষ্ঠুরভাবে এই সম্প্রদায়কে দলন করেন।

পারস্যের রাজাদের মধ্যে নাসির উদ্দীন প্রথম য়ুরোপে যান আর তাঁর আমল থেকেই দেশকে বিদেশীর ঋণজালে জড়িত করা সুরু হোলো। তাঁর ছেলে মজফ্‌ফর উদ্দীনের আমলে এই জাল বিস্তৃত হবার দিকে চলল। তামাকের ব্যবসার একচেটে অধিকার তিনি দিলেন এক ইংরেজ কোম্পানিকে। এটা দেশের লোকের সইল না, তারা তামাক বয়কট ক'রে দিলে। দেশশুদ্ধ তামাকখোরদের তামাক ছাড়া সোজা নয়, কিন্তু তাও ঘটল। এই উপায়ে এটা রদ্ হয়ে গেল কিন্তু দণ্ড দিতে হোলো কোম্পানিকে খুব লম্বা মাপে। তারপরে লাগল্ রাশিয়া, তার হাতে রেলওয়ে। বেলজিয়ম থেকে কর্ম্মচারী এল পারস্যে ট্যাক্স আদায়ের কাজে—ইংরেজও উঠে পড়ে লাগল্ পারস্য বিভাগের কাজে।

এদিকে দেশের লোকের কাছ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে রাষ্ট্রসংস্কারের। শেষকালে রাজাকে মেনে নিতে হোলো। প্রথম পারসিক পার্লামেণ্ট খুলল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরে।

এ রাজা মারা গেলেন। ছেলে বসলেন গদিতে—শা মহম্মদ আলি। পারস্যে তখন প্রাদেশিক গবর্ণররা ছিল একএক নবাব বিশেষ, তারা সকল বিষয়েই দেয় বাধা। প্রজারা এদের বরখাস্ত করবার দাবী করলে, আর মাশুল আদায়ের বেলজিয়ান কর্ত্তাদেরও সরিয়ে দেবার প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উঠল।

বলা বাহুল্য, দেশের লোক পার্লামেণ্ট শাসনপদ্ধতিতে ছিল আনাড়ি। দায়িত্ব হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে তাদের হাত পেকে উঠল। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, রাজস্ব বিভাগ ছারখার।

অবশেষে একদা ইংরেজ রাশিয়ানে আপোষ হয়ে গেল। দুইকর্ত্তার একজন পারস্যের মুণ্ডের দিকে আর একজন তার ল্যাজের দিকে দুই হাওদা চড়িয়ে সওয়ার হয়ে বসল, অঙ্কুশরূপে সঙ্গে রইল সৈন্যসামন্ত। উত্তরদিকটা পড়ল রুশীয়ের ভাগে, দক্ষিণদিকটা ইংরেজের, অল্প একটুখানি বাকি রইল সেখানে পারস্যের বাতি টিম্‌টিম্‌ ক'রে জ্বলছে।

রাজায় প্রজায় তক্‌রার বেড়ে চল্‌ল। একদিন রাজার দল মোল্লার দলে মিশে পড়ল গিয়ে সহরের উপর, পার্লামেণ্টের বাড়ি দিলে ভূমিসাৎ ক'রে। কিন্তু দেশকে দাবিয়ে দিতে পার্‌ল না আবার একবার নতুন ক'রে কনষ্টিট্যুশনের পত্তন হোলো।

ইংরেজ ও রুশ উভয়েই মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে শাহকে দেশের লোক এমন বিশ্রীরকম ব্যস্ত করছে ব'লে। বলাই বাহুল্য নতুন কনষ্টিট্যুশনের প্রতি তাদের দরদ ছিল না। রুশীয় কর্ণেল লিয়াকভ একদিন সৈন্য নিয়ে পড়ল পার্লামেণ্টের উপরে। লড়াই বেধে গেল, বড়ো বড়ো অনেক সদস্য গেলেন মারা, কেউবা হলেন বন্দী, কেউবা গেলেন পালিয়ে। লণ্ডন টাইম্‌স্‌ বল্‌লেন, স্পষ্টই প্রমাণ হচ্চে স্বরাজতন্ত্র ওরিয়েনণ্টালদের ক্ষমতার অতীত।

তেহারান্‌কে ভীষণ অত্যাচারে নির্জ্জীব কর্‌লে বটে কিন্তু অন্য প্রদেশে যুদ্ধ চল্‌তে লাগ্‌ল। শেষে পালাতে হোলো রাজাকে দেশ ছেড়ে, তাঁর এগারো বছরের ছেলে উঠ্‌লেন রাজগদীতে। রাজা যাতে মোটা পেন্সন পান ইংরেজ এবং রুশ তার ব্যবস্থা কর্‌লেন। রুশীয়ের সাহায্যে পলাতক রাজা আবার এসে দেশ আক্রমণ কর্‌লেন। হার হোলো তাঁর।

আমেরিকা থেকে মর্গ্যান শুস্‌টার এলেন পারস্যের বিধ্বস্ত রাজস্ব বিভাগকে খাড়া ক'রে তুল্‌তে। ঠিক যে সময়ে তিনি কৃতকার্য্য হয়েছেন রাশিয়া বিরুদ্ধে লাগ্‌ল। পারস্যের উপর হুকুম জারি হোলো শুষ্টারকে

বিদায় করতে হবে। প্রস্তাব হোলো ইংরেজ এবং রুশের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিদেশীকে রাষ্ট্রকার্য্যে আহ্বান করা চলবে না। এ নিয়ে পার্লামেণ্টে বিরুদ্ধ আন্দোলন চলল। কিন্তু টি'ক্‌ল না। শুস্‌টার নিলেন বিদায়, রাষ্ট্রসংস্কারকরা কেউবা গেলেন জেলে, কেউবা গেলেন বিদেশে। এই সময়কার বিবরণ নিয়ে শুষ্টার The Strangling of Persia নামক যে বই লিখেছেন তার মতো শোকাবহ ইতিহাস অল্পই দেখা যায়।

এদিকে য়ুরোপের যুদ্ধ বাধল। তখন রুশিয়া সেই সুযোগে পারস্যে আপন আসন আরো ফলাও ক'রে নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হোলো। অবশেষে বল্‌শেভিক বিপ্লবের তাড়ায় তারা গেল সরে। এই সুযোগে ইংরেজ বস্‌ল উত্তর পারস্য দখল ক'রে। নিরন্তর লড়াই চলল দেশবাসীদের সঙ্গে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সার পার্সি কক্স এলেন পারস্যে ব্রিটিশ মন্ত্রী। তিনি পারসিক গভর্মেণ্টের এক দলের কাছ থেকে কড়ার করিয়ে নিলেন যে, সমগ্র পারস্যের আধিপত্য থাকবে ইংরেজের হাতে, তার শাসনকার্য্য ও সৈন্যবিভাগ ইংরেজের অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালিত হবে। এ'কে ভদ্রভাষায় বলে প্রোটেক্‌টোরেট্‌। এর নিগূঢ় অর্থটা সকলেরই কাছে সুবিদিত,—অর্থাৎ ওর উপক্রমণিকা বৈষ্ণবের ঝুলিতে, ওর উপসংহার শাক্তের কবলে। যাই হোক্ সম্পূর্ণ পার্লামেণ্টের কাছে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্যে পেশ করতে কারো সাহস হোলো না।

এই দুর্য্যোগের দিনে রেজা খাঁ তাঁর কসাক সৈন্য নিয়ে দখল করলেন তেহেরান। ওদিকে সোভিয়েট্‌ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠিয়ে উত্তর পারস্যে ইংরেজকে প্রতিরোধ করতে এল। ইংরেজ পারস্য ত্যাগ করলে। এতকালের নিরন্তর নিপীড়নের পর পারস্য সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করল।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন রাজদূত রট্‌ষ্টাইন এসে এই লেখাপড়া ক'রে দিলেন যে, এতকাল সাম্রাজ্যিক রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যে দলননীতি প্রবর্ত্তন করেছিল সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। পারস্যের যে-কোনো স্বত্ব রাশিয়ার কবলে গিয়েছিল সমস্তই তাঁরা ফিরিয়ে দিচ্চেন ; রাশিয়ার কাছে পারস্যের যে ঋণ ছিল তার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হোলো এবং রাশিয়া পারস্যে যে সমস্ত পথ বন্দর প্রভৃতি স্বয়ং নির্ম্মাণ করেছিল কোনো মূল্য দাবী না ক'রে সে সমস্তের স্বত্বই পারস্যকে অর্পণ করা হোলো।

রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী তারপরে প্রধান মন্ত্রী তারপরে প্রজাসাধারণের অনুরোধে রাজা হলেন। তাঁর চালনায় পারস্য অন্তরে বাহিরে নূতন বলে বলিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছে। রাষ্ট্রের নানাবিভাগে যে সকল বিদেশীর অধ্যক্ষতা ছিল তারা একে একে গেছে সরে। শোষণ, লুণ্ঠনবিভ্রাটের শান্তি হয়ে এল, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ কড়া পাহারা দাঁড়িয়ে আছে তর্জ্জনী তুলে। উদ্‌ভ্রান্ত পারস্য আজ নিজের হাতে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। জয় হোক্ রেজা শা পহ্লবীর।

এঁদের কাছে আর একটা খবর পাওয়া গেল, দেশের টাকা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। বিদেশ থেকে যারা কারবার করতে আসে সমান মূল্যের জিনিষ এখান থেকে না কিন্‌লে তাদের মাল বিক্রি বন্ধ। আমদানি রফতানির মধ্যে অসাম্য না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি।

৪

আমার শরীর ক্লান্ত তাই রাত্রের আহার একলা আমার ঘরে পাঠাবেন ব'লে এঁরা ঠিক করেছিলেন। রাজি হলুম না। বাগানে

গাছতলায় দীপের আলোকে সকলের সঙ্গে খেতে বসলুম। এখানকার দেশী ভোজ। পোলাও কাবাব প্রভৃতিতে আমাদের দেশের মোগলাই খানার সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ দেখা গেল না।

ক্লান্ত শরীরে শুতে গেলুম। যথারীতি ভোরের বেলায় প্রস্তুত হয়ে যখন দরজা খুলে দিয়েছি তখন ছুটি একটি পাখী ডাকতে আরম্ভ করেছে।

যাত্রা যখন আরম্ভ হোলো তখন বেলা সাড়ে সাতটা। বাইরে আফিমের ক্ষেতে ফুল ধরেছে; গেটের সামনে পথের ওপারে দোকান খুলেছে সবেমাত্র। সুন্দর স্নিগ্ধ সকালবেলা। বাঁ ধারে নিবিড় সবুজবর্ণ দাড়িমের বন, গমের ক্ষেত, তাতে নতুন চারা উঠেছে। এ বৎসর দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে ফসলে তেজ নাই, তবু এ জায়গাটি তৃণে গুল্মে রোমাঞ্চিত।

উপলবিকীর্ণ পথে ঠোকর খেতে খেতে গাড়ি চলেছে। উঁচু পাহাড়ের পথ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে এসে নামল। অন্যত্র সাধারণত নগরের কিছু আগে থাকতেই তার উপক্রমণিকা দেখা যায়, এখানে তেমন নয়, শূন্যে মাঠের প্রান্তে অকস্মাৎ শিরাজ বিরাজমান। মাটির তৈরি পাঁচিলগুলোর উপর থেকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ল পপ্‌লার, কমলালেবু, চেষ্ট্‌নাট্‌ এল্‌ম্‌ গাছের মাথা।

শিরাজের গবর্ণর আমাকে সমারোহ ক'রে নিয়ে গেলেন এক বড়ো বাড়িতে সভাগৃহে। কার্পেটপাতা মস্ত ঘর। ছুই প্রান্তের দেয়াল-বরাবর অভ্যাগতেরা বসেছেন, তাঁদের সাম্‌নে ফল মিষ্টান্ন সহযোগে চায়ের সরঞ্জাম ছোটো ছোটো টেবিলে সাজানো। এখানে শিরাজের সাহিত্যিকদল ও নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত। শিরাজনাগরিকদের হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম্ম এই,—শিরাজ সহর ছুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত

সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্প-কানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান, তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে ঊর্দ্ধে উত্থিত, এবং এখনি কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি বল্‌লেম, যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার-করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্চে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হোলো।

সভার পালা শেষ হোলে পর চল্‌লেম গবর্ণরের প্রাসাদে। পথে যে-শিরাজের পরিচয় হোলো সে নূতন শিরাজ। রাস্তা ঘরবাড়ি তৈরি চলছে। পারস্যের সহরে সহরে এই নূতন রচনার কাজ সর্ব্বত্রই জেগে উঠ্‌ল, নূতন যুগের অভ্যর্থনায় সমস্ত দেশ উৎসাহিত।

সৈনিকপংক্তির মধ্য দিয়ে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পার হয়ে গবর্ণরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেম। মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন সেখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অন্য সকল অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই যাতে বিশ্রাম করতে পারি সেই প্রার্থনা মতোই ব্যবস্থা হোলো। পরিষ্কার হয়ে নিয়ে আশ্রয় নিলুম শোবার ঘরে। তখন বেলা চারটে। রাত্রে নিমন্ত্রিতবর্গের সঙ্গে আহার ক'রে দীর্ঘদিনের অবসান।

সকালে গবর্ণর বললেন কাছে এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ি আছে

সেটা আমাদের বাসের জন্য প্রস্তুত। সেখানেই আমার বিশ্রামের সুবিধা হবে ব'লে বাসা বদল স্থির হোলো।

১৭ এপ্রিল। আজ অপরাহ্নে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা। গবর্ণর প্রথমে নিয়ে গেলেন চেম্বার অফ কমার্সে। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে ব'সে চা খেয়ে গেলেম সাদির সমাধিস্থানে। পথের দুইধারে জনতা। কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের কাপড় য়ুরোপীয়, কচিৎ দেখা গেল পাগড়ী ও লম্বা কাপড়। বর্ত্তমান রাজার আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেছে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সাম্‌নে কানা-তোলা ক্যাপ।

আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন, ভারতের প্রথাবিরুদ্ধ ও বিদেশী-ঘেঁষা এও সেইরকম। কর্ম্মিষ্ঠতার যুগে সাজের বাহুল্য স্বভাবতই খ'সে পড়ে। তা ছাড়া একেলে বেশ শ্রেণী নির্ব্বিশেষে বড়ো ছোটো সকলেরই সুলভ ও উপযোগী হবার দিকে ঝোঁক। য়ুরোপে একদা দেশে দেশে এমন কি এক দেশেই বেশের বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অথচ সমস্ত য়ুরোপ আজ এক পোষাক পরেছে, তার কারণ সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়ে বয়েছে একই হাওয়া। সময় অল্প, কাজের তাড়া বেশি, তার উপর সামাজিক শ্রেণীভেদ হাল্‌কা হয়ে এসেছে। আজ য়ুরোপের বেশ শুধু যে শক্ত মানুষের, তৎপর মানুষের তা নয়, এ বেশ সাধারণ মানুষের, যারা সবাই একই বড়ো রাস্তায় চলে। আজ পারস্য তুরুস্ক ইজিপ্ট এবং আরবের যে অংশ জেগেছে সবাই এই সর্ব্বজনীন উর্দ্দি গ্রহণ করেছে, নইলে বুঝি মনের বদল সহজ হয় না। জাপানেও তাই। আমাদেরও ধুতিপরা ঢিলে মন বদল করতে হোলে হয়তো বা পোষাক বদলানো দরকার। আমরা বহুকাল ছিলুম বাবু, হঠাৎ হয়েছি খণ্ড ত-ওয়ালা শ্রীযুৎ, অথচ বাবুর

দোদুল্যমান বেশই কি চিরকাল থাকবে? ওটাতে যে বসনবাহুল্য আছে সেটা যাই-যাই করছে, হাঁটু পর্য্যন্ত ছাঁটা পায়জামা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যুগের হুকুম শুধু মনে নয়, গায়ে এসেও লাগল, মেয়েদের বেশে পরিবর্ত্তনের ধাক্কা এমন ক'রে লাগেনি, কেননা মেয়েরা অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের সেতু, পুরুষরা বর্ত্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের।

সাদির সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই। আজকের মতো ফুল দিয়ে প্রদীপ দিয়ে কবরস্থান সাজানো হয়েছে। সেখান থেকে সমাধির পশ্চাতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভার মধ্যে গিয়ে আসন নিলুম চত্বরের সামনে সমুচ্চ প্রাচীর অতি সুন্দর বিচিত্র কার্পেটে আবৃত করা হয়েছে, মেজের উপরেও কার্পেট পাতা। সভাস্থ সকলেরই সামনে প্রাঙ্গণ ঘিরে ফল মিষ্টান্ন সাজানো। সভার ডান দিকে নীলাভ পাহাড়ের প্রান্তে সূর্য্য অস্তোন্মুখ। বামে সভার বাইরে পথের ওপারে উচ্চভূমিতে ভিড় জমেছে,—অধিকাংশই কালো কাপড়ে আচ্ছন্ন স্ত্রীলোক, মাঝে মাঝে বন্দুকধারী প্রহরী।

তিনটি পারসিক ভদ্রলোক তেহেরান থেকে এসেছেন আমাদের পথের সুবিধা ক'রে দেবার জন্যে। এঁদের মধ্যে একজন আছেন তিনি পররাষ্ট্রবিভাগীয় মন্ত্রীর ভাই ফেরুঘি। সকলে বলেন ইনি ফিলজফার; সৌম্য শান্ত এঁর মূর্ত্তি। ইনি ফ্রেঞ্চ জানেন কিন্তু ইংরেজি জানেন না। তবু কেবলমাত্র সংসর্গ থেকে এঁর নীরব পরিচয় আমাকে পরিতৃপ্তি দেয়। ভাষার বাধায় যে-সব কথা ইনি বল্‌তে পারলেন না, অনুমানে বুঝতে পারি সেগুলি মূল্যবান। ইনি আশা প্রকাশ করলেন আমার পারস্যে আসা সার্থক হবে! আমি বল্‌লুম, আপনাদের পূর্ব্বতন সুফীসাধক কবি ও রূপকারা যাঁরা, আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে; তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু

নূতন কালের যা দান তাকেও আমি অবজ্ঞা করিনে। এযুগে য়ুরোপ যে সত্যের বাহনরূপে এসেছে তাকে যদি গ্রহণ করতে না পারি তাহোলে তার আঘাতকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই ব'লে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্য্যকে হারিয়ে বাহিরের সম্পদকে গ্রহণ করা যায় না। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।

আজ সকালে হাফেজের সমাধি হয়ে বাগানবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবার কথা। তার পূর্ব্বে গবর্ণরের সঙ্গে এখানকার রাজার সম্বন্ধে আলাপ হোলো। একদা রেজা শা ছিলেন কসাক সৈন্যদলের অধিপতি মাত্র; বিদ্যালয়ে য়ুরোপের শিক্ষা তিনি পান নি, এমন কি পারসিক ভাষাতেও তিনি কাঁচা। আমার মনে পড়্‌ল আমাদের আকবর বাদশাহের কথা। কেবল যে বিদেশীর কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েছেন তা নয়, মোল্লাদের আধিপত্যজালে দৃঢ়বদ্ধ পারস্যকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেছেন।

আমি বল্‌লুম—দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্ম্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধি নিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।

গবর্ণর বল্‌লেন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বেড়া ডিঙিয়ে যতদিন না ভারত একাত্ম হবে ততদিন গোলটেবিল বৈঠকের ববগ্রহণ ক'রে তার নিষ্কৃতি নেই। অন্ধ যারা তারা ছাড়া পেলেও এগোয় না, এগোতে গেলেও মরে গর্ত্তে প'ড়ে।

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখ্‌তে বেরলুম। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চল্‌ছে। পুরোনো কবরের উপর আধুনিক কার-খানায় ঢালাই-করা জালির কাজের একটা মণ্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার

বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হোলো যেন আমাদের পুলিস রাজত্বের অর্ডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বস্‌লুম। সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত কর্‌লে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্ণরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্ম্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।

যে পাতা বেরল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরাণী ও কয়জনে মিলে যে তর্জ্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই।—কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয় কিন্তু সরল অর্থ ধর্‌লে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।

প্রথম অংশ।—মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

দ্বিতীয় অংশ।—স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি এও কি হবে সম্ভব? অহঙ্কৃত ধার্ম্মিকনামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সঙ্গতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে ব'সে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্ত প্রভাতে সূর্য্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সঙ্কেত। মনে হোলো আমরা

দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভর্ত্তি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্ম্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধ-প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হোলো আজ কত শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।

ভরপুর মন নিয়ে বাগানবাড়িতে এলুম। যাঁর বাড়ি তাঁর নাম শিরাজী। কলকাতায় ব্যবসা করেন। তাঁরই ভাইপো খলীলি আতিথ্য-ভার নিয়েছেন। পরিষ্কার নতুন বাড়ি, সাম্‌নেটি খোলা, অদূরে একটি ছোটো পাহাড়। কাঁচের শাসির মধ্যে দিয়ে প্রচুর আলো এসে সুসজ্জিত ঘর উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। প্রত্যেক ঘরেই ছোটো ছোটো টেবিলে বাদাম কিসমিস মিষ্টান্ন সাজানো।

চা খাওয়া হোলে পর এখানকার গানবাজনার কিছু নমুনা পেলুম। একজনের হাতে কানুন, একজনের হাতে সেতার জাতীয় বাজনা, গায়কের হাতে তালদেবার যন্ত্র, বাঁয়া-তবলার একত্রে মিশ্রণ। সঙ্গীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল, মধ্য অংশ ধীর মন্দ সকরুণ, শেষ অংশটা নাচের তালে। আমাদের দিশি সুরের সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেক মিল দেখ্‌তে পাই। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখ্‌ছি এখানকার সঙ্গীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

ইস্ফাহানে যাত্রা কর্‌বার পূর্ব্বে বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছি। ব'সে আছি দোতলার মাদুরপাতা লম্বা বারান্দায়। সম্মুখ-প্রান্তে রেলিঙের গায়ে গায়ে টবে সাজানো পুষ্পিত জেরেনিয়ম। নিচের বাগানে ফুলের কেয়ারির মাঝখানে ছোটো জলাশয়ে একটি নিষ্ক্রিয় ফোয়ারা, আর সেই

কেয়ারিকে প্রদক্ষিণ ক'রে কলশব্দে জলস্রোত বয়ে চলেছে। অদূরে বনস্পতির বীথিকা। আকাশে পাণ্ডুর নীলিমার গায়ে তরুহীন বলি-অঙ্কিত পাহাড়ের তরঙ্গায়িত ধূসর রেখা। দূরে গাছের তলায় কারা একদল ব'সে গল্প করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। সহর থেকে দূরে আছি, জনতার সম্পর্ক নেই, পাখীরা কিচিমিচি ক'রে উড়ে বেড়াচ্চে তাদের নাম জানিনে। সঙ্গীরা সহরে কে-কোথায় চলে গেছে,—চিরক্লান্ত দেহ চল্‌তে নারাজ তাই একলা ব'সে আছি। পারস্যে আছি সে কথা বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেবার কিছুই নেই। এই আকাশ বাতাস, কম্পমান সবুজপাতার উপর কম্পমান এই উজ্জ্বল আলো, আমারি দেশের শীতকালের মতো।

শিরাজ সহরটি যে প্রাচীন তা বলা যায় না। আরবেরা পারস্য জয় করার পরে তবে এই সহরের উদ্ভব। সাফাবি শাসনকালে শিরাজের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল আফগান আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। আগে ছিল সহর ঘিরে পাথরের তোরণ, সেটা ভূমিসাৎ হয়ে তার জায়গায় উঠেছে মাটির দেয়াল। নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাত থেকে পারস্য যেমন বরাবর আঘাত পেয়েছে পৃথিবীতে আর কোনো দেশ এমন পায়নি, তবে তার জীবনীশক্তি বারবার নিজের পুনঃসংস্কার করেছে। বর্ত্তমান যুগে আবার সেই কাজে সে লেগেছে, জেগে উঠেছে আপন মূর্চ্ছিত দশা থেকে।

৫

চলেছি ইস্ফাহানের দিকে। বেলা সাতটার পর সিরাজের পুরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলা সুরু হোলো।

পিছনে তাকিয়ে মনে হয় যেন গিরিপ্রকৃতি শিলাঞ্জলিতে সিরাজকে অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দিয়েছে।

শিরাজের বাইরে লোকালয় একেবারে অন্তর্হিত, তার পরিশিষ্ট কিছুই নেই, গাছপালাও দেখা যায় না। বৈচিত্র্যহীন রিক্ততার মধ্য দিয়ে যে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে, সেটা মোটর-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।

প্রায় এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল শস্যক্ষেত, গম এবং আফিম। কিন্তু গ্রাম দেখিনে, দিগন্ত পর্য্যন্ত অবারিত। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া লোমওয়ালা ভেড়ার পাল, কোথাও বা ছাগলের কালো রোঁয়ায় তৈরি চৌকো তাঁবু। শস্যশ্যামল মাঠ ক্রমে প্রশস্ত হয়ে চলেছে। দূরের পাহাড়গুলো খাটো হয়ে এল যেন তারা পাহাড়ের শাবক।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অনতিদূরে পর্সিপোলিস্। দিগ্বিজয়ী দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নশেষ। উচ্চ মাটির মঞ্চ, তার উপরে ভাঙা ভাঙা বড়ো বড়ো থাম, অতীত মহাযুগ যেন আকাশে অক্ষম বাহু তুলে নির্ম্মম কালকে ধিক্কার দিচ্চে।

আমাকে চৌকিতে বসিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে তুলে নিয়ে গেল। পিছনে পাহাড়, উর্দ্ধে শূন্য, নিচে দিগন্ত-প্রসারিত জনশূন্য প্রান্তর, তারি প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই পাথরের রুদ্ধ-বাণীর সঙ্কেত। বিখ্যাত পুরাবশেষবিৎ জর্ম্মান ডাক্তার হর্টজ্‌ফেল্‌ট এই পুরাতন কীর্ত্তি উদ্ঘাটন করবার কাজে নিযুক্ত। তিনি বল্‌লেন বার্লিনে আমার বক্তৃতা শুনেছেন আর হোটেলেও আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন।

পাথরের থামগুলো কোনোটা ভাঙা, কোনোটা অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। নিরর্থক দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে, ম্যুজিয়মে অতিকায় জন্তুর অসংলগ্ন অস্থিগুলোর মতো। ছাদের জন্যে যে সব কাঠ লেগেছিল, হিসাবের তালিকায় দেখা

গেছে ভারতবর্ষ থেকে আনীত সেগুন কাঠও ছিল তার মধ্যে। খিলেন বানাবার বিদ্যা তখন জানা ছিল না ব'লে পাথরের ছাদ সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে বিদ্যার জোরে এই সকল গুরুভার অতি প্রকাণ্ড পাথরগুলি যথা-স্থানে বসানো হয়েছিল সে বিদ্যা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দেখে মনে পড়ে মহাভারতের ময়দানবের কথা। বোঝা যায় বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণের বিদ্যা যাদের জানা ছিল তারা যুধিষ্ঠিরের স্বজাতি ছিল না। হয়তো বা এইদিক থেকেই রাজমিস্ত্রী গেছে। যে পুরোচন পাণ্ডবদের জন্য সুরঙ্গ বানিয়েছিল সেও তো যবন।

ডাক্তার বললেন, আলেকজাণ্ডার এই প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। আমার বোধ হয় পরকীর্ত্তিঅসহিষ্ণু ঈর্ষাই তার কারণ। তিনি চেয়েছিলেন মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করতে, কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় তাঁর আগেই দেখা দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার একিমীনিয় সম্রাটদের পারস্যকে লণ্ডভণ্ড করে গিয়েছেন।

এই পর্সিপোলিসে ছিল দরিয়ুসের গ্রন্থাগার। বহু সহস্র চর্ম্মপত্রে রূপালি সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তা লিপীকৃত হয়ে এইখানে রক্ষিত ছিল। যিনি এটাকে ভস্মসাৎ করেছিলেন তাঁর ধর্ম্ম এর কাছে বর্ব্বরতা। আলেকজান্দার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যান নি যা পর্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ স্বরূপে তুলনীয় হোতে পারে। এখানে দেয়ালে খোদিত মূর্ত্তিশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় দরিয়ুস আছেন রাজছত্র তলে, আর তাঁর সম্মুখে বন্দী ও দাসেরা অর্ঘ্য বহন ক'রে আনছে। পরবর্ত্তীকালে ইস্ফাহানের কোনো উজীর এই শিলালেখ্য ভেঙে বিদীর্ণ বিকলাঙ্গ ক'রে দিয়েছে।

পারস্যে আর এক জায়গা খনন ক'রে প্রাচীনতর বিস্মৃত যুগের জিনিষ পাওয়া গেছে। অধ্যাপক তারি একটি নক্সাকাটা ডিমের খোলার পাত্র

আমাকে দেখালেন। বললেন মহেঞ্জদারোর যে রকম কারুচিত্র এও সেই জাতের। সার অরেল ষ্টাইন মধ্য এসিয়া থেকেও এমন কিছু কিছু জিনিষ পেয়েছেন মহেঞ্জদারোয় যার সাদৃশ্য মেলে। এই রকম বহুদূর বিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলি দেখে মনে হয় আধুনিক সকল সভ্যতার পূর্ব্বে একটা বড়ো সভ্যতা পৃথিবীতে তার লীলা বিস্তার ক'রে অন্তর্ধান করেছে।

অধ্যাপক এই ভগ্নশেষের এক অংশ সংস্কার ক'রে নিজের বাসা ক'রে নিয়েছেন। ঘরের চারিদিকে লাইব্রেরি, এবং নানাবিধ সংগ্রহ। দরিয়ুস জারাক্সিস এবং আর্টাজারাক্সিস এই তিন পুরুষবাহী সম্রাটের লুপ্তশেষ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে অধ্যাপক নিভৃতে খুব আনন্দে আছেন।

এদেশে আসবামাত্র সবচেয়ে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব্ব এসিয়ার সঙ্গে পশ্চিম এসিয়ার প্রাকৃতিক চেহারার সম্পূর্ণ পার্থক্য। উভয়ে একেবারেই বিপরীত বললেই হয়। আফগানিস্থান থেকে আরম্ভ ক'রে মেসো-পোটেমিয়া হয়ে আরব্য পর্য্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে নীরস কঠিন। পূর্ব্ব এসিয়ার গিরিশ্রেণী ধরণীর প্রতিকূলতা করে নি, তাদেরই প্রসাদবর্ষণে সেখানকার সমস্ত দেশ পরিপুষ্ট। কিন্তু পশ্চিমে তারা পৃথিবীকে বন্ধুর করেছে এবং অবরুদ্ধ করেছে আকাশের রসের দৌত্য। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত আকারে এখানকার অনাদৃত মাটি উর্ব্বরতার স্পর্শ পায়, দুর্লভ ব'লেই তার লোভনীয়তা প্রবল, মনোহর তার রমণীয়তা।

সৌভাগ্যক্রমে এরা বাহন পেয়েছে উট এবং ঘোড়া, আর জীবিকার জন্যে পালন করেছে ভেড়ার পাল। এই জীবিকার অনুসরণ ক'রে এখানকার মানুষকে নিরন্তর সচল হয়ে থাকতে হোলো। এই পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বারে বারে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে—তার মূল প্রেরণা পেয়েছে এখানকার ভূমির কঠোরতা থেকে, যা তাদের বাইরে ঠেলে বের করে দেয়। তারা প্রকৃতির

অযাচিত আতিথ্য পায় নি, তাদের কেড়ে খেতে হয়েছে পরের অন্ন, আহার সংগ্রহ করতে হয়েছে নূতন নূতন ক্ষেত্রে এগিয়ে এগিয়ে।

এখানে পল্লির চেয়ে প্রাধান্য দুর্গরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত নগরের। কত প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসশেষ পাশ্চাত্য এশিয়ায় ধূলি-পরিকীর্ণ। কৃষিজীবীদের স্থান পল্লী, সেখানে ধন স্বহস্তে উৎপাদন করতে হয়। নগর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়জীবী যোদ্ধৃদের প্রতাপের উপরে। সেখানে সম্পদ সংগ্রহ ও রক্ষণ না করলে পরাভব। ভারতবর্ষে কৃষি-জীবিকার সহায় গোরু, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় জয়জীবিকার সহায় ঘোড়া। পৃথিবীতে কী মানুষের, কী বাহনের, কী অস্ত্রের ত্বরিত গতিই জয়সাধনের প্রধান উপায়। তাই একদিন মধ্য এশিয়ার মরুবাসী অশ্ব-পালক মোগল বর্ব্বরেরা বহুদূর পৃথিবীতে ভীষণ জয়ের সর্ব্বনাশ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চিরচলিষ্ণুতাই তাদের ক'রে তুলেছিল দুর্দ্ধর্ষ। অন্ন সঙ্কোচের জন্যেই এরা এক একটি জাতি জাতিতে বিভক্ত—এই জাতি জাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য ঐক্য। যে কারণেই হোক তাদের এই ঐক্য যখন বহু শাখাধারার সম্মিলিত ঐক্যে স্ফীত হয়েছে তখন তাদের জয়বেগকে কিছুতে ঠেকাতে পারে নি। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আরবীয় মরুবাসী জাতি-জাতিরা যখন এক অখণ্ড ধর্ম্মের ঐক্যে এক দেবতার নামে মিলে ছিল তখন অচিরকালের মধ্যেই তাদের জয়পতাকা উড়েছিল কালবৈশাখীর রক্তরাগ-রঞ্জিত মেঘের মতো দূর পশ্চিমদিগন্ত থেকে দূর পূর্ব্বদিক্ প্রান্ত পর্য্যন্ত।

একদা আর্য্যজাতির এক শাখা পর্ব্বতবিকীর্ণ মরুবেষ্টিত পারস্যের উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিলে। তখন কোনো এক অজ্ঞাতনামা সভ্যজাতি ছিল এখানে। তাদের রচিত যে সকল কারুদ্রব্যের চিহ্নশেষ পাওয়া যায় তার নৈপুণ্য বিস্ময়জনক। বোধ করি বলা যেতে পারে মহেঞ্জদারো যুগের মানুষ। তাদের সঙ্গে এদের হাতের কাজের মিল আছে। এই

মিল এসিয়ায় বহুদূর বিস্তৃত। মহেঞ্জদারোর স্মৃতিচিহ্নের সাহায্যে তৎকালীন ধর্ম্মের যে চেহারা দেখতে পাই অনুমান করা যায় সে বৃষভ-বাহন শিবের ধর্ম্ম। রাবণ ছিলেন শিবপূজক, রাম ভেঙেছিলেন শিবের ধনু। রাবণ যে জাতের মানুষ সে জাতি না ছিল অরণ্যচর না ছিল পশুপালক। রামায়ণগত জনশ্রুতি থেকে বোঝা যায় সে জাতি পরাভূত দেশ থেকে ঐশ্বর্য্যসংগ্রহ ক'রে নিজের রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেছে, এবং অনেকদিন বাহুবলে উপেক্ষা করতে পেরেছে আর্য্যদেবতা ইন্দ্রকে। সে জাতি নগরবাসী। মহেঞ্জদারোর সভ্যতাও নাগরিক। ভারতের আদিম আরণ্যক বর্ব্বরতর জাতির সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্য্যেরা এই সভ্যতা নষ্ট করে। সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণকথায়, দক্ষযজ্ঞে; একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবের উপাসক, আজও হিন্দুরা সে উপাখ্যান পাঠ করে ভক্তির সঙ্গে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের কাছে বৈদিক দেবতার খর্ব্বতার কথা গৌরবের সঙ্গে পৌরাণিক ভারতে আখ্যাত হয়ে থাকে।

খৃষ্টজন্মের দেড়হাজার বছর পূর্ব্বে ইরাণী আর্য্যরা পারস্যে এসেছিলেন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই মত। তাঁদের হোমাগ্নির জয় হোলো। ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, উর্ব্বর, জনসঙ্কুল। সেখানকার আদিমজাতের নানাধর্ম্ম, নানারীতি। তার সঙ্গে জড়িত হয়ে বৈদিক ধর্ম্ম আচ্ছন্ন, পরিবর্ত্তিত ও অনেক অংশে পরিবর্জ্জিত হোলো, বহুবিধ, এমন কি, পরস্পর বিরুদ্ধ হোলো তার আচার, নানা দেবদেবী নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভ্যাগত হওয়াতে ভারতবর্ষে ধর্ম্মজটিলতার অন্ত রইল না। পারস্যে এবং মোটের উপর পাশ্চাত্য এসিয়ার সর্ব্বত্রই বাসযোগ্য স্থান সঙ্কীর্ণ, এবং সেখানে অন্নক্ষেত্রের পরিধি পরিমিত। সেই ছোটো জায়গায় যে আর্য্যেরা বাসপত্তন করলেন, তাঁদের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সংহতি রইল,

অনার্য্যজনতার প্রভাবে তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম বহু জটিল ও বিকৃত হোলো না। এসিয়ার এই বিভাগে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোপ্রায় জাতির বসতি ছিল তার প্রমাণ পুরাতন সাহিত্যে আছে—কিন্তু ইরাণীয়দের আর্য্যত্বকে তারা অভিভূত করতে পারে নি।

পারস্যের ইতিহাস যখন শাহনামার পুরাণকথা থেকে বেরিয়ে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল তখন পারস্যে আর্য্যদের আগমন হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। তখন দেখি আর্য্যজাতির দুইশাখা পারস্য ইতিহাসের আরম্ভ-কালকে অধিকার করে আছে,—মীদিয় এবং পারসিক। মীদিয়েরা প্রথমে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে তারপরে পারসিক। এই পারসিক-দের দলপতি ছিলেন হখমানিশ। তাঁরই নাম অনুসারে এই জাতি গ্রীকভাষায় আকেমেনিড (Achaemenid) আখ্যা পায়। খৃষ্টজন্মের সাড়ে পাঁচশো বছর পূর্ব্বে আকেমেনীয় পারসিকেরা মীদিয়দের শাসন থেকে সমস্ত পারস্যকে মুক্ত ক'রে নিজেদের অধীনে একচ্ছত্র করে। সমগ্র পারস্যের সেই প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরস, তাঁর প্রকৃত নাম খোরাস। তিনি শুধু যে সমস্ত পারস্যকে এক কর্‌লেন তা নয় সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজ্‌দা। ভারতীয় আর্য্যদের বরুণদেবের সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য। বাহ্যিক প্রতিমার কাছে বাহ্যিক পূজা আহরণের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই তাঁর আরাধনা ছিল না। তিনি তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য ও সাধুকর্ম্ম। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্য্যদেবতার মতোই তাঁর মন্দির ছিল না, এবং এখানকার মতোই ছিল অগ্নিবেদী।

তখনকার কালের সেমেটিক জাতীয়দের যুদ্ধে দয়াধর্ম্ম ছিল না।

দেশজোড়া হত্যা, লুঠ, বিধ্বংসন, বন্ধন, নির্ব্বাসন এই ছিল রীতি। কিন্তু সাইরস ও তাঁর পরবর্ত্তী সম্রাটদের রাষ্ট্রনীতি ছিল তার বিপরীত। তাঁরা বিজিত দেশে ন্যায়বিচার, সুব্যবস্থা ও শান্তিস্থাপন ক'রে তাকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলেন, পারসিক রাজারা যুদ্ধ করেছেন মিতাচারিতার সঙ্গে, বিজিত জাতিদের প্রতি অনির্দ্দয় হিতৈষণা প্রকাশ করেছেন, তাদের ধর্ম্মে, তাদের আচারে হস্তক্ষেপ করেন নি, তাদের স্বাদেশিক দলনায়কদের স্বপদে রক্ষা করেছেন। তার প্রধান কারণ, কী যুদ্ধে কী দেশজয়ে তাঁদের ধর্ম্মনীতিকে তাঁরা ভুলতে পারেন নি। ব্যাবিলোনিয়ায় আসীরিয়ায় পূজার ব্যবহারে ছিল দেবমূর্ত্তি। বিজেতারা বিজিত জাতির এই সব মূর্ত্তি নিয়ে যেত লুঠ ক'রে। সাইরসের ব্যবহার ছিল তার বিপরীত। এই রকম লুঠ-করা মূর্ত্তি তিনি যেখানে যা পেয়েছেন সেগুলি সব তাদেব আদিম মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর অনতিকাল পরে তাঁরই জ্ঞাতিবংশীয় দরিয়ুস সাম্রাজ্যকে শত্রু হস্ত থেকে উদ্ধার ক'রে আরো বহুদূর প্রসারিত করেন। পর্সিপোলিসের স্থাপনা এঁরই সময় হতে। এই যুগের আসীরিয়া ব্যাবিলন ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশে বহুকীর্ত্তি প্রধানত দেবমন্দির আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আকেমেনীয় রাজত্বে তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। শত্রুজয়ের বিবরণ-চিত্র যে-যেখানে পাহাড়ের গায়ে খোদিত সেখানেই জরথুষ্ট্রীয়দের বরণীয় দেবতা আহুরমজ্‌দার ছবি শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধিলাভ যে তাঁরই প্রসাদে এই কথাটি তার মধ্যে স্বীকৃত। কিন্তু মন্দিরে মূর্ত্তিস্থাপন ক'রে পূজা হোত তার প্রমাণ নেই। প্রতীকরূপে অগ্নিস্থাপনার চিহ্ন পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রথম আরম্ভ হতেই একদেবতার সরল পূজাপদ্ধতি পারসিক জাতিকে ঐক্য এবং শক্তি দেবার সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বড়ো সাম্রাজ্য হাতে নিয়ে স্থির থাকবার জো নেই। কেবলি তাকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হয় বিশেষত চারিদিকে যেখানে প্রতিকূল শক্তি। এই রকম নিত্য প্রয়াসে বলক্ষয় হয়ে ক্লান্তি দেখা দেয়। অবশেষে হঠাৎ আঘাতে অতি স্থূল রাষ্ট্রিক দেহটা চারিদিক থেকে ভেঙে পড়ে। কোনো জাতির মধ্যে বা রাজবংশে সাম্রাজ্যভার অতি দীর্ঘকাল বহন করবার শক্তি টিঁকে থাকতেই পারে না। কেননা সাম্রাজ্য পদার্থটাই অস্বাভাবিক—যে এককগুলির সমষ্টিতে সেটা গঠিত তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই—জবরদস্তির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে ভিতরে ভিতরে নিরন্তর চেষ্টা করে, তা ছাড়া বহুবিস্তৃত সীমানা বহুবিচিত্র বিবাদের সংস্রবে আসতে থাকে। আকেমেনীয় সাম্রাজ্যও আপন গুরুভারে ক্রমেই হীনবল হয়ে অবশেষে আলেকজান্দারের হাতে চরম আঘাত পেলে। এক আঘাতেই সে পড়ে গেল তার একমাত্র কারণ আলেকজান্দার নয়। অতি বৃহদাকার প্রতাপের দুর্ভর ভার বাহকেরা একদিন নিশ্চিত বর্জ্জন করতে বাধ্য—ভগ্ন-উরু ধূলিশায়ী মৃত দুর্য্যোধনের মতো ভগ্নাবশিষ্ট পর্সিপোলিস এই তত্ত্ব আজ বহন করছে। আলেকজান্দারের জোড়াতাড়া দেওয়া সাম্রাজ্যও অল্পকালের আয়ু নিয়েই সেই তত্ত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিল সে কথা সুবিদিত।

এখান থেকে আর এক ঘণ্টার পথ গিয়ে সাদাতাবাদ গ্রামে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন। একটি বড়ো রকমের গ্রাম, পথের দুইধারে ঘন সংলগ্ন কাঁচা ইঁটের ও মাটির ঘর, দোকান ও ভোজনশালা। পেরিয়ে গিয়ে দেখি পথের ধারে ডানপাশে মাটি ছেয়ে নানা রঙের মেঠোফুল ভিড় ক'রে আছে। দীর্ঘ এল্‌ম্‌ বনস্পতির ছায়াতলে তন্বী জলধারা স্নিগ্ধ কলশব্দে প্রবাহিত। এই রমণীয় উপবনে ঘাসের উপর কার্পেট বিছিয়ে আহার হোলো। পোলাও মাংস ফল ও যথেষ্ট পরিমাণে ঘোল।

আকাশে মেঘ জমে আস্‌ছে। এখান থেকে নব্বই মাইল পরে আবাদে নামক ছোটো সহর, সেখানে রাত্রিযাপনের কথা। দূরে দেখা যাচ্চে তুষাররেখার তিলককাটা গিরিশিখর। দেহ্‌বিদ্‌ গ্রাম ছাড়িয়ে সুর্মাকে পৌঁছলুম। পথের মধ্যে সেখানকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী অভ্যর্থনা জানিয়ে আগে চলে গেলেন। বেলা পাঁচটার সময় পৌঁছলুম পুরপ্রাসাদে। কাল ভোরের বেলা রওনা হয়ে ইস্ফাহানে পৌঁছব দ্বিপ্রহরে।

যারা খাঁটি ভ্রমণকারী তারা জাতই আলাদা। একদিকে তাদের শরীর মন চিরচলিষ্ণু, আর একদিকে অনভ্যস্তের মধ্যে তাদের সহজ বিহার। যারা শরীরটাকে স্তব্ধ রেখে মনটাকে চালায় তারা অন্য শ্রেণীর লোক। অথচ রেলগাড়ি মোটর গাড়ির মধ্যস্থতায় এই দুই জাতের পংক্তিভেদ রইল না। কুণো মানুষের ভ্রমণ আপন কোণ থেকে আপন কোণেই আসবার জন্যে। আমাদের আধ্যাত্মিক ভাষায় যাদের বলে কনিষ্ঠ অধিকারী। তারা বাঁধা রাস্তায় সস্তায় টিকিট কেনে, মনে করে মুক্তিপথে ভ্রমণ সারা হোলো, কিন্তু ঘটা ক'রে ফিরে আসে সেই আপন সঙ্কীর্ণ আড্ডায়, লাভের মধ্যে হয় তো সংগ্রহ করে অহঙ্কার।

ভ্রমণের সাধনা আমার ধাতে নেই, অন্তত এই বয়সে। সাধক যারা, দুর্গমতার কৃচ্ছ-সাধনে তাদের স্বভাবের আনন্দ, পথ খুঁজে বের করবার মহৎ ভার তাদের উপর। তারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী, ভ্রমণের চরম ফল তারাই পায়। আমি আপাতত মোটরে চড়ে চললেম ইস্ফাহানে।

সকালবেলা মেঘাচ্ছন্ন, কাল বিকেল থেকেই তার আয়োজন। আজ শীত পড়েছে রীতিমতো। একঘেয়ে শূন্যপ্রায় প্রান্তরে আসন্ন বৃষ্টির ছায়া বিস্তীর্ণ। দিগন্ত বেষ্টন ক'রে যে গিরিমালা, নীলাভ অস্পষ্টতায় সে অবগুণ্ঠিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি অন্তহীন, আলের

চিহ্নহীন মাঠের মধ্যে বিসর্পিত পথ দিয়ে। কিন্তু মানুষ কোথায়? চাষী কেন হাল লাঙল নিয়ে মাঠে আসে না? হাটের দিন হাট করতে যায় না কেউ; ফসলের ক্ষেত নিড়োবার বুঝি দরকার নেই? দূরে দূরে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে, তার থেকে আন্দাজ করা যায়, ঐ দিগন্তের বাইরে অদৃশ্য নেপথ্যে কোথাও মানুষের নানা দ্বন্দ্ববিঘট্টিত সংসারযাত্রা চলেছে। মাঠে কোথাও বা ফসল, কোথাও বা বহুদূর ধ'রে আগাছা, তাতে ঊর্দ্ধপুচ্ছ সাদা সাদা ফুলের স্তবক। মাঝে মাঝে ছোটো নদী, কিন্তু তাতে আঁকড়ে নেই গ্রাম, মেয়েরা জল তোলে না, কাপড় কাচে না, স্নান করে না, গোরুবাছুর জল খায় না, নির্জ্জন পাহাড়ের তলা দিয়ে চলে, যেন সন্তানহীন বিধবার মতো। অনেকক্ষণ পরে বিনা ভূমিকায় এসে পড়ে মাটির পাঁচিলে-ঘেরা গ্রাম, একটু পরেই আর তার অনুবৃত্তি নেই, আবার সেই শূন্য মাঠ, আর মাঠের শেষে ঘিরে আছে পাহাড়।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি এই উচ্চভূমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে নেমে গেছে আর সেই গহ্বরতল থেকে খাড়া একটা পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে খোপে খোপে মানুষের বাসা, ভাঙন-ধরা পদ্মার পাড়িতে গাঙশালিখের বাসার মতো। চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কোটর-নিবাসগুলিতে প্রবেশের জন্যে কাঠের তক্তা-ফেলা সঙ্কীর্ণ সাঁকো। মানুষের চাকের মতো এই লোকালয়টির নাম ইয়েজ্‌দিখস্ত্‌।

দুপর বেজেছে। ইস্ফাহানের পৌরজনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা বহন ক'রে মোটর রথে লোক এল। সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে এই শা-রেজা গ্রামের একটি কবির কাব্য ছিল মিলিত। সেই কাব্যটির ইংরেজি তর্জ্জমা এইখানে লিখে দিই :—

The caravans of India always carry sugar but this time it has the perfume of the muse. O caravan, please stop your march, because burning hearts are following thee like the butterflies which burn around the flame of candles.

O zephyr, softly blow and whisper on the tomb of Saadi. Thereupon in joy Saadi will come to life in his tomb.

Tagore, he is the unique, the philosopher who knows what is past and what the future holds.

Let his arrival be blessed and fortunate in the land of the great Cyrus an august descendant of whom today fortunately wears the crown of Persia.

পথের ধারে দেখা দিল এল্‌ম্‌, পপ্‌লার, অলিভ ও তুঁত গাছের শ্রেণী। সামনে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে দূর প্রসারিত ইস্ফাহান সহর।

৬

পূর্ব্বেই ব'লে রেখেছিলুম, আমি সম্মাননা চাইনে, আমাকে যেন একটি নিভৃত জায়গায় যথাসম্ভব শান্তিতে রাখা হয়। উপর থেকে সেই-রকম হুকুম এসেছে। তাই এসেছি একটি বাগানবাড়িতে। বাগানবাড়ি বললে এ'কে খাটো করা হয়। এ একটি মস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। যিনি

গবর্ণর তিনি ধীর সুগম্ভীর, শান্ত তাঁর সৌজন্য, এঁর মধ্যে প্রাচ্য প্রকৃতির মিতভাষী অচঞ্চল আভিজাত্য।

শুনতে পাই এই বাড়ির যিনি মালিক তিনি আমাদের দেশের সেকেলে কোনো কোনো ডাকাতে জমীদারদের মতো ছিলেন। একদা এখানে সশস্ত্রে সসৈন্যে অনেক দৌরাত্ম্য করেছেন। এখন অস্ত্র সৈন্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে তেহেরানে রাখা হয়েছে, কারাবন্দী-রূপে নয়, নজরবন্দীরূপে। তাঁর ছেলেদের য়ুরোপে শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসননীতির সঙ্গে কিছু প্রভেদ দেখ্‌ছি। মোহ্‌মেরার শেখ, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজিত করবার চেষ্টা করাতে রাজা সৈন্য নিয়ে তাকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন। তখন শেখ সন্ধির প্রার্থনা করতেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর হোলো। এখন তিনি তেহেরানে বাসা পেয়েছেন। তাঁর প্রতি নজর রাখা হয়েছে কিন্তু তাঁর গলায় ফাঁস বা হাতে শিকল চড়েনি।

অপরাহ্ণে যখন সহরে প্রবেশ করেছিলুম তখন ক্লান্ত দৃষ্টি শ্রান্ত মন ভালো ক'রে কিছুই গ্রহণ করতে পারে নি। আজ সকালে নির্ম্মল আকাশ, স্নিগ্ধ রৌদ্র। দোতলায় একটি কোণের বারান্দায় বসেছি। নিচের বাগানে এলম্ পপ্‌লার উইলো গাছে বেষ্টিত ছোটো জলাশয় ও ফোয়ারা। দূরে গাছপালার মধ্যে একটি মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্চে, যেন নীলপদ্মের কুঁড়ি, সুচিক্কণ নীল পারসিক টালি দিয়ে তৈরী, এই সকালবেলাকার পাৎলা মেঘে ছোঁওয়া আকাশের চেয়ে ঘনতর নীল। সাম্‌নেকার কাঁকর-বিছানো রাস্তায় সৈনিক প্রহরী পায়চারি করছে।

এ পর্য্যন্ত সমস্ত পারস্যে দেখে আসছি এরা বাগানকে কী ভালোই না বাসে। এখানে চারিদিকে সবুজ রঙের দুর্ভিক্ষ, তাই চোখের ক্ষুধা

মেটাবার এই আয়োজন। বাবর ভারতবর্ষে বাগানের অভাব দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মরুপ্রদেশ থেকে, বাগান তাঁদের পক্ষে শুধু কেবল বিলাসের জিনিষ ছিল না, ছিল অত্যাবশ্যক। তাকে বহুসাধনায় পেতে হয়েছে ব'লে এত ভালোবাসা। বাংলা দেশের মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের মতো পরবার সাড়িতে রঙের সাধনা করে না, চারিদিকেই রঙ এত সুলভ। বাংলায় দোলাই কাঁথায় রঙ ফ'লে ওঠেনি, লতাপাতার রঙিন ছাপ-ওয়ালা ছিট পশ্চিমে। বাড়ির দেয়ালে রং লাগায় মাড়োয়ারি, বাঙালি লাগায় না।

আজ সকালবেলায় স্নান করবার অবকাশ রইল না। একে একে এখানকার ম্যুনিসিপালিটি, মিলিটারি বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, বণিকসভা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন।

বেলা তিনটের পর সহর পরিক্রমণে বেরলুম। ইস্পাহানের একটি বিশেষত্ব আছে সে আমার চোখে সুন্দর লাগল। মানুষের বাসা প্রকৃতিকে একঘরে ক'রে রাখেনি, গাছের প্রতি তার ঘনিষ্ঠ আনন্দ সহরের সর্ব্বত্রই প্রকাশমান। সারি বাঁধা গাছের তলা দিয়ে জলের ধারা চলেছে, সে যেন মানুষেরই দরদের প্রবাহ। গাছপালার সঙ্গে নিবিড় মিলনে নগরটিকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ ব'লে চোখে ঠেকে। সাধারণত উড়ো জাহাজে চ'ড়ে সহরগুলোকে দেখলে যেন মনে হয় পৃথিবীর চর্ম্মরোগ।

মানুষের নিজের হাতের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে এই সহরের মাঝখানে, একটি বৃহৎ ময়দান ঘিরে। এর নাম ময়দান-ই-শা অর্থাৎ বাদশাহের ময়দান। এখানে এককালে বাদশাহের পোলো খেলবার জায়গা ছিল। এই চত্বরের দক্ষিণ সীমানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মস্‌জিদ্-ই-শা। প্রথম শা আব্বাসের আমলে এর নির্ম্মাণ আরম্ভ, আর তাঁর পুত্র দ্বিতীয়

শা আব্বাসের সময়ে তার সমাপ্তি। এখন এখানে ভজনার কাজ হয় না। বর্ত্তমান বাদশাহের আমলে বহুকালের ধূলো ধুয়ে এ'কে সাফ করা হচ্চে। এর স্থাপত্য একাধারে সমুচ্চ গম্ভীর ও সযত্ন-সুন্দর, এর কারুকার্য্য বলিষ্ঠ শক্তির সুকুমার সুনিপুণ অধ্যবসায়ের ফল। এর পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি মস্‌জিদ মাদ্রাসে-ই-চাহার বাগ-এ প্রবেশ কর্‌লুম। একদিকে উচ্ছ্রিত বিপুলতায় এ সুমহান, যেন স্তবমন্ত্র, আর একদিকে সমস্ত ভিত্তিকে খচিত ক'রে বর্ণ-সঙ্গতির বিচিত্রতায় রমণীয়, যেন গীতিকাব্য। ভিতরে একটি প্রাঙ্গণ, সেখানে প্রাচীন চেনার গাছ এবং তুঁত, দক্ষিণধারে অত্যুচ্চ গুম্বজওয়ালা সুপ্রশস্ত ভজনাগৃহ। যে টালিতে ভিত্তি মণ্ডিত তার কোথাও কোথাও চিক্কণ পাৎলা বর্ণপ্রলেপ ক্ষয়প্রাপ্ত, কোথাও বা পর-বর্ত্তীকালে টালি বদল কর্‌তে হয়েছে, কিন্তু নূতন যোজনাটা খাপ খায় নি। আগেকার কালের সেই আশ্চর্য্য নীল রঙের প্রলেপ একালে অসম্ভব। এ ভজনালয়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্চে এর সুনির্ম্মল সমুদার গাম্ভীর্য্য। অনাদর অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন কোথাও নেই। সর্ব্বত্র একটি সসম্ভ্রম সম্মান যথার্থ শুচিতা রক্ষা ক'রে বিরাজ কর্‌ছে।

এই মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে যাদের দেখ্‌লেম, তাদের মোল্লার বেশ। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, হয় তো মনে মনে প্রসন্ন হয় নি। শুন্‌লুম আর দশবছর আগে এখানে আমাদের প্রবেশ সম্ভবপর হোত না। শুনে আমি যে বিস্মিত হব সে রাস্তা আমার নেই। কারণ আর বিশ বছর পরেও পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে আমার মতো কোনো ব্রাত্য যে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে সে আশা করা বিড়ম্বনা।

সহরের মাঝখান দিয়ে বালুশয্যার মধ্যে বিভক্ত-ধারা একটি নদী চলে গেছে। তার নাম জই আন্দেরু, অর্থাৎ জন্মদায়িনী। এই নদীর তলদেশে যেখানে খোঁড়া যায় সেখান থেকেই উৎস ওঠে তাই এর এই নাম—

উৎসজননী। কল্‌কাতার ধারে গঙ্গা যে রকম ক্লিষ্ট কলুষিত শৃঙ্খল-জর্জ্জর, এ সে রকম নয়। গঙ্গাকে কল্‌কাতা কিঙ্করী করেছে, সখী করেনি, তাই অবমানিত নদী হারিয়েছে তার রূপলাবণ্য। এখানকার এই পুরবাসিনী নদী গঙ্গার তুলনায় অগভীব ও অপ্রশস্ত বটে কিন্তু এর সুস্থ সৌন্দর্য্য নগরের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে আনন্দ বহন ক'রে।

এই নদীর উপরকার একটি ব্রিজ দেখ্‌তে এলুম, তার নাম আলিবর্দ্দী-খাঁর পুল। আলিবর্দ্দী শা আব্বাসের সেনাপতি, বাদশার হুকুমে এই পুল তৈরি করেছিলেন। পৃথিবীতে আধুনিক ও প্রাচীন অনেক ব্রিজ আছে তার মধ্যে এই কীর্ত্তিটি অসাধারণ। বহুখিলানওয়ালা তিনতলা এই পুল ; শুধু এটার উপর দিয়ে পথিক পার হয়ে যাবে ব'লে এ তৈরি হয় নি,—অর্থাৎ এ শুধু উপলক্ষ্য নয় এও স্বয়ং লক্ষ্য। এ সেই দিল্‌-দরিয়া যুগের রচনা যা আপনার কাজের তাড়াতেও আপন মর্য্যাদা ভুল্‌ত না।

ব্রিজ পার হয়ে গেলুম এখানকার আর্ম্মানি গির্জ্জায়। গির্জ্জার বাহিরে ও অঙ্গনে ভিড জমেছে।

ভিতরে গেলেম। প্রাচীন গির্জ্জা। উপাসনা ঘরের দেয়াল ও ছাদ চিত্রিত অলঙ্কৃত। দেয়ালেব নিচের দিকটায় সুন্দর পারসিক টালির কাজ, বাকি অংশটায় বাইবল্‌-বর্ণিত পৌরাণিক ছবি আঁকা। জনশ্রুতি এই যে, কোনো ইটালিয়ন চিত্রকর ভ্রমণ করতে এসে এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন।

তিন শো বছর হয়ে গেল শা আব্বাস রুশিয়া থেকে বহু সহস্র আর্ম্মানি আনিয়ে ইস্পাহানে বাস করান। তারা কারিগর ছিল ভালো। তখনকার দেশবিজয়ী রাজারা শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে শিল্পীদেরও লুঠ করতে ছাড়তেন না। শা আব্বাসের মৃত্যুর পর তাদের উপর উৎপাত আরম্ভ

হোলো। অবশেষে নাদির শাহের আমলে উপদ্রব এত অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল যে টিকতে পারলে না। সেই সময়েই আর্ম্মানীরা প্রথম ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। বর্ত্তমান বাদশাহের আমলে তাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু সেকালে কারুনৈপুণ্য সম্বন্ধে তাদের যে খ্যাতি ছিল এখন তার আর কিছু বাকি আছে ব'লে বোধ হোলো না।

বাজারের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। আজ কী একটা পরবে দোকানের দরজা সব বন্ধ। এখানকার সুদীর্ঘ চিনার বীথিকায় গিয়ে পড়লুম। বাদশাহের আমলে এই রাস্তার মাঝখান দিয়ে টালি-বাঁধানো নালায় জল বইত, মাঝে মাঝে খেল্‌ত ফোয়ারা, আর ছিল ফুলের কেয়ারি। দরকারের জিনিষকে করেছিল আদরের জিনিষ, পথেরও ছিল আমন্ত্রণ, আতিথ্য।

ইস্পাহানের ময়দানের চারিদিকে যে সব অত্যাশ্চর্য্য মস্‌জিদ দেখে এসেছি তার চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরছে। এই রচনা যে-যুগের সে বহুদূরের, শুধু কালের পরিমাপে নয় মানুষের মনের পরিমাপে। তখন এক একজন শক্তিশালী লোক ছিলেন সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি। ভূতল সৃষ্টির আদিকালে ভূমিকম্পের বেগে যেমন বড়ো পাহাড় উঠে পড়েছিল তেম্‌নি। এই পাহাড়কে সংস্কৃত ভাষায় বলে ভূধর, অর্থাৎ সমস্ত ভূমিকে এই এক একটা উচ্চচূড়া দৃঢ় ক'রে ধারণ করে এই রকম বিশ্বাস। তেম্‌নি মানব সমাজের আদিকালে এক একজন গণপতি সমস্ত মানুষের বল আপনার মধ্যে সংহত ক'রে জনসাধারণকে নিজের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাতে সর্ব্বসাধারণ আপনার সার্থকতা দেখে আনন্দ পেত। তাঁরা এক্‌লাই যেমন সর্ব্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তেম্‌নি তাঁদেরই মধ্যে সর্ব্বজনের গৌরব, বহুজনের কাছে বহু কালের কাছে তাঁদের জবাবদিহী। তাঁদের কীর্ত্তিতে কোনো অংশে দারিদ্র্য থাক্‌লে

সেই অমর্য্যাদা বহুলোকের বহুকালের। এই জন্যে তখনকার মহৎ ব্যক্তির কীর্ত্তিতে দুঃসাধ্য সাধন হয়েছে। সেই কীর্ত্তি একদিকে যেমন আপন স্বাতন্ত্র্যে বড়ো তেমনি সর্ব্বজনীনতায়। মানুষ আপন প্রকাশে বৃহতের যে কল্পনা করতে ভালোবাসে তাকে আকার দেওয়া সাধারণ লোকের সাধ্যের মধ্যে নয়। এইজন্য তাকে উপযুক্ত আকারে প্রকাশ দেবার ভার ছিল নরোত্তমের, নরপতির। রাজা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে, কিন্তু বস্তুত সে প্রাসাদ সমস্ত প্রজার—রাজার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রজা সেই প্রাসাদের অধিকারী। এই জন্যে রাজাকে অবলম্বন ক'রে প্রাচীনকালে মহাকায় শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল। পর্সিপোলিসে দরিয়ুস রাজার রাজগৃহে যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেটা দেখে মনে হয় কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারের পক্ষে সে নিতান্ত অসঙ্গত। বস্তুত একটা বৃহৎ যুগ তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল—সে যুগে সমস্ত মানুষ এক একটি মানুষে অভিব্যক্ত।

পর্সিপোলিসের যে কীর্ত্তি আজ ভেঙে পড়েছে তাতে প্রকাশ পায় সেই যুগ গেছে ভেঙে। এ রকম কীর্ত্তির আর পুনরাবর্ত্তন অসম্ভব। যে প্রান্তরে আজকের যুগ চাষ করছে, পশু চরাচ্চে, যে পথ দিয়ে আজকের যুগ তার পণ্য বহন ক'রে চলেছে, সেই প্রান্তরের ধারে সেই পথের প্রান্তে এই অতিকায় স্তম্ভগুলো আপন সার্থকতা হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তবু মনে হয় দৈবাৎ যদি না ভেঙে যেত, তবু আজকেকার সংসারের মাঝখানে থাকতে পেত না, যেমন আছে অজন্তার গুহা, আছে তবু নেই। ঐ ভাঙা থামগুলো সেকালের একটা সঙ্কেতমাত্র নিয়ে আছে ব্যতিব্যস্ত বর্ত্তমানকে পথ ছেড়ে দিয়ে—সেই সঙ্কেতের সমস্ত সুমহৎ তাৎপর্য্য অতীতের দিকে। নিচের রাস্তায় ধূলো উড়িয়ে ইতরের মতো গর্জ্জন ক'রে চলেছে মোটর রথ। তাকেও অবজ্ঞা করা যায় না তার মধ্যেও মানব-মহিমা

আছে—কিন্তু এরা পৃথক্ জাত—সগোত্র নয়। একটাতে আছে সর্ব্ব-জনের সুযোগ, আর একটাতে আছে সর্ব্বজনের আত্মশ্লাঘা। এই শ্লাঘার প্রকাশে আমরা দেখ্‌তে পেলুম সেই অতীতকালে মানুষ কেমন ক'রে প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এক একটি বিরাট আকারে আপনাকে দেখতে চেয়েছে। প্রয়োজনের পরিমাপে সে আকারের মূল্য নয়, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিকেই বলে ঐশ্বর্য্য—সেই ঐশ্বর্য্যকে তার অসামান্যরূপে মানুষ দেখতে পায় না যদি কোনো প্রবল শক্তিশালীর মধ্যে আপন শক্তিকে উৎসৃষ্ট ক'রে এই ঐশ্বর্য্যকে ব্যক্ত করা না হয়। নিজের নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের মধ্যে প্রতি-দিন খরচ হয়ে যায়, সেই দিনযাত্রা প্রয়োজনের অতীত মাহাত্ম্যকে বাঁধতে পারে না। সেই ঐশ্বর্য্য যুগ, যে ঐশ্বর্য্য আবশ্যককে অবজ্ঞা করতে পারত এখন চলে গেছে। তার সাজসজ্জা সমারোহভার এখনকাব কাল বহন করতে অস্বীকার করে। অতএব সেই যুগের কীর্ত্তি এখনকার চলতি কালকে যদি চেপে বসে তবে এইকালের অভিব্যক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।

মানুষের প্রতিভা নবনবোন্মেষে, কোনো একটামাত্র আবির্ভাবকেই দীর্ঘায়িত করার দ্বারা নয়, সে আবির্ভাব যতই সুন্দর যতই মহৎ হোক। মাদুরার মন্দির ইস্পাহানের মসজিদ প্রাচীন কালের অস্তিত্বের দলিল—এখনকার কালকে যদি সে দখল করে তবে তাকে জবরদখল বলব। তারা যে সজীব নয় তার প্রমাণ এই যে আপন ধারাকে আর তারা চালনা করতে পারছে না। বাইরে থেকে তাদের হয়তো নকল করা যেতে পারে কিন্তু নিজের ভিতরে তাদের নূতন সৃষ্টির আবেগ ফুরিয়ে গেছে।

এদের কৈফিয়ৎ এই যে, এরা যে-ধর্ম্মের বাহন এখনো সে টিঁকে আছে। কিন্তু আজকের দিনে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ধর্ম্মের বিশুদ্ধ

প্রাণতত্ত্ব নিয়ে টিঁকে নেই। যে সমস্ত ইঁট কাঠ নিয়ে সেই সব সম্প্রদায়কে কালে কালে ঠেকো দিয়ে দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ অন্যকালের আচার বিচার প্রথা বিশ্বাস জনশ্রুতি। তাদের অনুষ্ঠান, তাদের অনুশাসন এককালের ইতিহাসকে অন্যকালের উপর চাপা দিয়ে তাকে পিছিয়ে রাখে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম জিনিষটাই সাবেককালের জিনিষ। পুরাকালের কোনো একটা বাঁধামত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে এই হচ্চে সম্প্রদায়ের শাসন। বস্তুত এতকাল রাজশক্তি ও পৌরোহিত-শক্তি জুড়ি মিলিয়ে চলেছে। উভয়েই জনসাধারণের আত্মশাসন ভাব চিন্তার ভার পূজার ভার তাদের স্বাধীন শক্তির থেকে হরণ ক'রে অন্যত্র এক জায়গায় সংহত ক'রে রেখেছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি নিজের চিত্তশক্তির প্রবর্ত্তনায় স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা করে তবে সেটাকে বিদ্রোহের কোঠায় ফেলে তাকে প্রাণান্তকর কঠোরতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি ক্রমে এক কেন্দ্রের হাত থেকে সাধারণের পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে—অথচ চিরকালের মতো বাঁধা মতের ধর্ম্মসম্প্রদায় আজকের দিনে সকলেরই চিত্তকে এক শাসনের দ্বারা ভয়ের দ্বারা লোভের দ্বারা মোহের দ্বারা অভিভূত ক'রে স্থাবর করে রেখে দেবে এ আর চল্‌বে না। এই কারণে এই রকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যা কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর ক'রে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোওয়াবে, বয়স উত্তীর্ণ হোলেও যে ছেলে মায়ের কোল আঁকড়ে মেয়েলি স্বভাব নিয়ে থাকে তারই মতো অপদার্থ হয়ে থাকবে।

প্রাচীন কীর্ত্তি টিঁকে থাকবে না এমন কথা বলিনে। থাক্ কিন্তু সে কেবল স্মৃতির বাহনরূপে, ব্যবহারের ক্ষেত্ররূপে নয়। যেমন আছে স্ক্যাণ্ডিনেবিয় সাগা, তাকে কাব্য ব'লে স্বীকার করব, ধর্ম্মগ্রন্থ ব'লে ব্যবহার

করব না। যেমন আছে প্যারাডাইস্‌ লষ্ট, তাকে ভোগ করবার জন্যে, মানবার জন্যে নয়। য়ুরোপে পুরাতন ক্যাথীড্রাল আছে অনেক, কিন্তু মানুষের মধ্যযুগীয় যে ধর্ম্মবোধ থেকে তার উদ্ভব ভিতরে ভিতরে তার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। ঘাট আছে, জল গেছে সরে। সে ঘাটে নৌকো বেঁধে রাখতে বাধা নেই কিন্তু সে নৌকোয় খেয়া চলবে না। যুগে যুগে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, তার অভিজ্ঞতার সংশোধন, তার অবস্থার পরিবর্ত্তন চলেছেই, মানুষের মন সেই সঙ্গে যদি অচল আচারে বিজড়িত ধর্ম্মকে শোধন ক'রে না নেয় তাহোলে ধর্ম্মের নামে হয় কপটতা নয় মূঢ়তা নয় আত্মপ্রবঞ্চনা জমে উঠতে থাকবেই। এই জন্যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে এমন বিষয়বুদ্ধি করে নি। বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয় ধর্ম্মমতের আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট, অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে ইতিহাসে তার ধারাবাহিক প্রমাণ আছে, আর তার সর্ব্বনেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর কোথাও নয়।

এ সঙ্গে এ কথাও আমার মনে এসেছে যে মনুর পরামর্শ ছিল ভালো। সংসারের ধর্ম্মই হচ্চে সে সরে সরে যায়, অথচ একটা বয়সের পর যাদের মন আর কালের সঙ্গে তাল রেখে সরতে পারে না সংসারের ব্যবহার থেকে তাদের দূরে থাকা উচিত—যেমন দূরে আছে ইলোরার গুহা, খণ্ডগিরির মূর্ত্তি সব। যদি তারা নিজের যুগকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে তবে তাদের মূল্য আছে কিন্তু সে মূল্য আদর্শের মূল্য। আদর্শ একটা জায়গায় স্থিরত্বে ঠেকেছে ব'লেই তাকে দিয়ে আমরা পরিমাপের কাজ করি। জলের মধ্যে যদি কোথাও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বন্যার উচ্ছলতা কতদূর উঠ্‌ল সেই পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা ক'রে সেটা আমরা বুঝতে পারি—কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সে পাহাড়ের কারবার নেই। তেমনি

মানুষের কীর্ত্তি ও ব্যক্তিত্ব যখন প্রচলিত জীবনযাত্রার সঙ্গে অসংসক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা আমাদের অন্য কোনো কাজ না হোক আদর্শ রচনার কাজে লাগে। এই আদর্শ নকল করায় না। শক্তির মধ্যে বেগ সঞ্চার করে, মহামানব নিজেকেই বহুগুণিত করবার জন্যে নয়, প্রত্যেক মানুষকে তার আপন শক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমতার দিকে অগ্রসর করবার জন্যে। পুরাতন-কালের বুদ্ধ যদি সেই আদর্শের কাজে লাগে তাহোলে নূতনকালেও সে সার্থক। কিন্তু যদি সে নিজেকে চিরকাল পুনরাবর্ত্তিত করবে ব'লে পণ ক'রে বসে তবে সে আবর্জ্জনা সৃষ্টি করবে।

অভ্যাসে যে মনকে পেয়ে বসে সে মনের মতগুলো মনন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ চিন্তধারার সঙ্গে চিন্তিত বিষয়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়। ফুলের বা ফলের পালা যখন ফুরোয় তখন শাখার রসধারা তাকে বর্জ্জন করতে চেষ্টা করে কিন্তু তবু সে যদি বৃন্ত আঁকড়িয়ে থাকে তবে সেটা নিছক লোকসান। এই জন্যেই মনুর কথা মানি, পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। স্বাধীন শক্তিতে চিন্তা করা প্রশ্ন করা পরীক্ষা করার দ্বারাই মানুষের মনোবৃত্তি সুস্থ ও বীর্য্যবান থাকে। যারা সত্যই জরায়-পাওয়া তারা সমাজের সেই নূতন অধ্যবসায়ী পরীক্ষাপরায়ণ প্রশ্নরত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকে নষ্ট না করুক বাধা না দিক মনুর এই ছিল অভিপ্রায়। পৃথিবীতে যে-সমাজ তরুণ বৃদ্ধ বা প্রবীণ বৃদ্ধের অধিকৃত সে সমাজ পঙ্গু; বৃদ্ধের কর্ম্ম-শক্তি অস্বাভাবিক অতএব সে কর্ম্ম স্বাস্থ্যকর নয়। তাদের মনের সক্রিয়তা স্বভাবের নিয়মে বাইরের দিক থেকে সরে এসে অন্তরের দিকে পরিণত হোতে থাকে তাই তাদের নিজের সার্থকতার জন্যেও অভি-ভাবকের পদ ছেড়ে দিয়ে সংসার থেকে নিভৃতে যাওয়াই কর্ত্তব্য—তাতে ক্ষতি হবে একথা মনে করা অহঙ্কার মাত্র।

আজ ছাব্বিশে। পনেরো দিন মাত্র দেশ থেকে চলে এসেছি। কিন্তু

মনে হচ্চে যেন অনেকদিন হয়ে গেল। ভেবে দেখলুম, তার কারণ এ নয় যে, অনভ্যস্ত প্রবাসবাসের দুঃখ সময়কে চিরায়মান করেছে। আসল কথা এই যে, দেশে থাকি নিজের সঙ্গে নিতান্ত নিকটে আবদ্ধ বহু খুচ্‌রো কাজের ছোটো ছোটো সময় নিয়ে। এখানে অনেকটা পরিমাণে নিজেকে ও নিজকীয়কে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপক ভূমিকার উপরে থাকি। ভূমিতল থেকে নিঃসংসক্ত উর্দ্ধে যেমন অনেকখানি দেশকে দেখা যায় তেমনি নিজের সুখদুঃখের জালে বদ্ধ প্রয়োজনের স্তূপে আচ্ছন্ন সময় থেকে দূরে এলে অনেকখানি সময়কে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তখন যেন দিনকে দেখিনে যুগকে দেখি—দেখি ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফে নয়।

গবর্ণরের ব্যবস্থায় এ দুইদিন রাত্রির আহারের পর ঘণ্টাখানেক ধ'রে এখানকার সঙ্গীত শুনতে পাই। বেশ লাগে। টার ব'লে যে তারের যন্ত্র, অতি সূক্ষ্ম মৃদুধ্বনি থেকে প্রবল ঝঙ্কার পর্য্যন্ত তার গতিবিধি। তাল দেবার যন্ত্রটাকে বলে ডম্বক, তার বোলের আওয়াজে আমাদের বাঁয়াতবলার চেয়ে বৈচিত্র্য আছে।

ইস্পাহানে আজ আমার শেষদিন, অপরাহ্নে পুরসভার তরফ থেকে আমার অভ্যর্থনা। যে প্রাসাদে আমার আমন্ত্রণ সে শা আব্বাসের আমলে, নাম চিহিল সতুন। সমুচ্চ পাথরের স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত এর অলিন্দ, পিছনে সভামণ্ডপ; তার পিছনে প্রশস্ত একটি ঘর, দেয়ালে বিচিত্র ছবি আঁকা। এক সময়ে কোন এক কদুৎসাহী শাসনকর্ত্তা চুনকাম ক'রে সমস্তটা ঢেকে দিয়েছিলেন। হাল আমলে ছবিগুলিকে আবার প্রকাশ করা হচ্চে।

এখানকার কাজ শেষ হোলো।

দৈবাৎ এক একটি সহর দেখতে পাওয়া যায় যার স্বরূপটি সুস্পষ্ট,

প্রতি মুহূর্ত্তে যার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। ইস্পাহান সেই রকম সহর। এটি পারস্য দেশের একটি পীঠস্থান। এর মধ্যে বহুযুগের, শুধু শক্তি নয়, প্রেম সজীব হয়ে আছে।

ইস্পাহান পারস্যের একটি অতি প্রাচীন সহর। একজন প্রাচীন ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় সেলজুক রাজবংশীয় সুলতান মহম্মদের মাদ্রাসা ও সমাধির সম্মুখে তখন একটি প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি প'ড়ে ছিল। কোনো একজন সুলতান ভারতবর্ষ থেকে এটি এনেছিলেন। তার ওজন ছিল প্রায় হাজার মণ।

দশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট শা আব্বাস আর্দাবিল থেকে তাঁর রাজধানী এখানে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সাফাবি বংশীয় এই শা আব্বাস পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি।

তিনি যখন সিংহাসনে উঠলেন তখন তাঁর বয়স ষোলো, ষাট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। রুদ্ধ বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তাঁর রাজত্বের আরম্ভ। সমস্ত পারস্যকে একীকরণ এঁর মহৎকীর্ত্তি। ন্যায়বিচারে, দাক্ষিণ্যে, ঐশ্বর্য্যে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁর ঔদার্য্য ছিল অনেকটা দিল্লীশ্বর আকবরের মতো। তাঁরা এক সময়ের লোকও ছিলেন। তাঁর রাজত্বে পরধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উৎপীড়ন ছিল না। কেবল শাসননীতি নয়, তাঁর সময়ে পারস্যে স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা সর্ব্বোচ্চসীমায় উঠেছিল। ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মহিমার অবসান। অবশেষে একদা তাঁর শেষ বংশধর শা সুলতান হোসেন পারস্যবিজয়ী সুলতান মামুদের আসনতলে প্রণতি ক'রে বললেন, "পুত্র, যেহেতু জগদীশ্বর আমার রাজত্ব আর ইচ্ছা করেন না অতএব আমার সাম্রাজ্য এই তোমার হাতে সমর্পণ করি।"

এর পরে আফগান রাজত্ব। শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে হত্যা ও গুপ্তহত্যা

এগিয়ে চল্‌ল। চারিদিকে লুঠপাট ভাঙাচোরা। অত্যাচারে জর্জ্জরিত হোলো ইস্পাহান।

অবশেষে এলেন নাদির শা, বাল্যকালে ছাগল চরাতেন, অবশেষে একদিন ভাগ্যের চক্রান্তে আফগান ও তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়ে এই রাখাল চড়ে বসলেন শা আব্বাসের সিংহাসনে। তাঁর জয়পতাকা দিল্লি পর্য্যন্ত উড়ল। স্বরাজ্যে যখন ফিরলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন বহুকোটি টাকা দামের লুটের মাল ও ময়ূরতক্ত সিংহাসন। শেষ বয়সে তাঁর মেজাজ গেল বিগ্‌ড়ে, আপন বড়ো ছেলের চোখ উপড়িয়ে ফেল্‌লেন। মাথায় খুন চড়ল। অবশেষে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে প্রাণ দিলেন তাঁর কোনো এক অনুচরের ছুরির ঘায়ে; শেষ হয়ে গেল বিজয়ী রাজমহিমা অখ্যাত মৃত্যুশয্যায়।

তারপরে অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি, চোখওপড়ানো। বিপ্লবের আবর্ত্তে রক্তাক্ত রাজমুকুট লাল বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে আর ফেটে যায়। কোথা থেকে এল খাজার বংশীয় তুর্কি আগা মহম্মদ খাঁ। খুন ক'রে লুঠ ক'রে হাজার হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী ক'রে আপন পাশবিকতার চূড়ো তুললে ফর্ম্মাণ শহরে, নগরবাসীর সত্তর হাজার উৎপাটিত চোখ হিসাব ক'রে গ'ণে নিলে। মহম্মদখাঁর দস্যুবৃত্তির চরমকীর্ত্তি রইল খোরাসানে, সেখানে নাদির শাহের হতভাগ্য অন্ধ পুত্র শা রুখ ছিল রাজা। হিন্দুস্থান থেকে নাদির শাহের বহুমূল্য লুঠের মাল গুপ্ত রাজকোষ থেকে উদ্গীর্ণ ক'রে নেবার জন্যে দস্যুশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শা রুখকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। অবশেষে একদিন শা রুখের মুণ্ড ঘিরে একটা মুখোষ পরিয়ে তার মধ্যে শিষে গালিয়ে ঢেলে দিলে। এমনি ক'রে শা রুখের প্রাণ এবং ঔরঙ্গজেবের চুনি তার হস্তগত হোলো। তারপরে এসিয়ায় ক্রমে এসে পড়ল

য়ুরোপের বণিকদল, ইতিহাসের আর এক পর্ব্ব আরম্ভ হোলো পূর্ব্ব পশ্চিমের সংঘাতে। পারস্যে তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠ্ছিল তখন ঐ খাজার বংশীয় রাজা সিংহাসনে। বিদেশীর ঋণের নাগপাশে দেশকে জড়িয়ে সে ভোগবিলাসে উন্মত্ত, দুর্ব্বল হাতের রাজদণ্ড চালিত হচ্ছিল বিদেশীর তর্জ্জনী সঙ্কেতে।

এমন সময় দেখা দিলেন রেজা শা। পারস্যের জীর্ণ জর্জ্জর রাষ্ট্রশক্তি সর্ব্বত্র আজ উজ্জ্বল নবীন হয়ে উঠ্চে। আজ আমি আমার সামনে যে ইস্পাহানকে দেখছি তার উপর থেকে অনেকদিনের কালো কুহেলিকা কেটে গেছে। দেখা যায় এতকালের দুর্য্যোগে ইস্পাহানের লাবণ্য নষ্ট হয় নি।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে পারস্য বারবার দলিত হয়েছে তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃ পুনঃ নিজেকে প্রকাশ করতে পারলে। আমার কাছে মনে হয় তার প্রধান কারণ একেমেনীয়, সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য বারম্বার সুদৃঢ় হয়েছে। পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয় কিন্তু বিভক্ত হয় না। রুশে ইংরেজে মিলে তার রাষ্ট্রিক সত্তাকে একদা দুখানা করতে বসেছিল। যদি তার ভিতরে ভিতরে বিভেদ থাক্‌ত তাহোলে য়ুরোপের আঘাতে টুক্‌রো টুক্‌রো হোতে দেরি হোত না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শক্তিমান রাষ্ট্রনেতা সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে ডাক দিলেন, অমনি সমস্ত দেশ তাঁকে স্বীকার করতে দেরি করলে না, অবিলম্বে প্রকাশ পেলে যে পারস্য এক।

পারস্য যে অন্তরে অন্তরে এক, তার প্রধান একটা প্রমাণ তার শিল্পের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। একেমেনীয় যুগে পারস্যে যে

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উদ্ভাবিত হোলো তার মধ্যে এসীরিয়, ব্যাবিলোনীয়, ইজিপ্‌টীয় প্রভাবের প্রমাণ আছে। এমন কি তখনকার প্রাসাদনির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজে বিপুল সাম্রাজ্যভুক্ত নানাদেশীয় কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রভাববিশিষ্ট ঐক্য লাভ করেছিল পারসিক চিত্তের দ্বারা। রজার ফ্রাই এ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন এখানে উদ্ধৃত করি—

This extreme adaptability is, I think, a constant trait in Persian art. * * We tend, perhaps, at the present time to exaggerate the importance of originality in an art; we admire in it the expression of an independent and self-contained people, forgetting that originality may arise from a want of flexibility in the artist's make-up as well as from a new imaginative outlook.

নানা প্রভাব চারিদিক থেকে আসে, জড়বুদ্ধি তাকে ঠেকিয়ে রাখে, সচেতন বুদ্ধি তাকে গ্রহণ ক'রে আপনার মধ্যে তাকে ঐক্য দেয়। নিজের মধ্যে একটা প্রাণবান ঐক্যতত্ত্ব থাকলে বাইরের বহুকে মানুষ একে পরিণত ক'রে নিতে পারে। পারস্য তার ইতিহাসে তার আর্টে বাইরের অভ্যাগমকে আপন অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

পারস্যের ইতিহাস ক্ষেত্রে একদিন যখন আরব এল তখন অতি অকস্মাৎ তার প্রকৃতিতে একটা মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটল। একথা মনে রাখা দরকার যে বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম দীক্ষা দেওয়ার রীতি তখনো আরব গ্রহণ করে নি। আরব শাসনের আরম্ভকালে পারস্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বাস করত এবং শিল্পরচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচিকে বাধা দেওয়া হয়নি। পারস্যে ইসলাম ধর্ম্ম অধিবাসীদের স্বেচ্ছানুসারে ক্রমে

ক্রমে সহজে পরিবর্তিত হয়েছে। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষেরই মতো পারস্যে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ছিল কঠিন, তদনুসারে শ্রেণীগত অবিচার ও অবমাননা জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চয়ই পীড়ার কারণ হয়েছিল। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর পূজার সমান অধিকার ও পরস্পরের নিবিড় আত্মীয়তা এই ধর্ম্মের প্রতি প্রজাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই। এই ধর্ম্মের প্রভাবে পারস্যে শিল্পকলার রূপ পরিবর্ত্তন করাতে রেখালঙ্কার ও ফুলের কাজ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তারপরে তুর্কিরা এসে আরব সাম্রাজ্য ও সেই সঙ্গে তাদের বহুতর কীর্ত্তি লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে, অবশেষে এল মোগল। এই সকল কীর্ত্তিনাশার দল প্রথমে যতই উৎপাত করুক ক্রমে তাদের নিজেদেরই মধ্যে শিল্পোৎসাহ সঞ্চারিত হোতে লাগল। এমনি ক'রে যুগান্তে যুগান্তে ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে বারবার শিল্পের নবযুগ এসেছে। আকেমেনীয়, সাসানীয়, আরবীয়, সেলজুক, মোগল এবং অবশেষে সাফাবি শাসনের পর্ব্বে পর্ব্বে শিল্পের প্রবাহ বাঁক ফিরে ফিরে চলেছে, তবু লুপ্ত হয়নি, এ রকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর কোনো দেশে দেখা যায় না।

৭

২৯ এপ্রেল। ইস্ফাহান থেকে যাত্রা করা গেল তেহেরানের দিকে। নগরের বাহিরেও অনেকদূর পর্য্যন্ত সবুজ ক্ষেত, গাছপালা ও জলের ধারা। মাঝে মাঝে গ্রাম। কোথাও বা তা'রা পরিত্যক্ত। মাটির প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি জীর্ণতার নানাভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, ভিতের উপরে ছাদ নেই। এক জায়গায় এই রকম ভাঙা শূন্য গ্রামের সাম্‌নেই পথের ধারে পড়ে আছে উটের কঙ্কাল। ঐ ভাঙা ঘরগুলো, আর ঐ প্রাণীটার

বুকের পাঁজর একই কথা বল্‌ছে। প্রাণের ভারবাহী যে সব বাহন প্রাণ-হীন কিছুদিন তারাই থাকে বোবার মতো প'ড়ে, আর প্রাণ যায় চলে। এখানকার মাটির ঘর যেন মাটির তাঁবু,—উপস্থিত প্রয়োজনের ক্ষণিক তাগিদে খাড়া করা, তারপরে তার মূল্য ফুরিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি, এই তো ভালো। গড়ে তোলাও সহজ, ফেলে যাওয়াও তাই। বাসার সঙ্গে নিজেকে ও অপরিচিত আগামী-কালকে বেঁধে রাখবার বিড়ম্বনা নেই। মানুষের কেবল যদি একটা মাত্র দেহ থাকত বংশানুক্রমে সকলের জন্যে, খুব মজবুত চতুর্দ্দন্ত হাতির হাড় আর গণ্ডারের সাতপুরু চামড়া দিয়ে খুব পাকা ক'রে তৈরি, চোদ্দো পুরুষের একটা সরকারী দেহ, যেটা অনেকজনের পক্ষে মোটামুটিভাবে উপযোগী কিন্তু কোনো একজনের পক্ষে প্রকৃষ্টভাবে উপযুক্ত নয় নিশ্চয় সেই দেহ-দুর্গটা প্রাণপুরুষের পছন্দসই হোত না। আপন বসতবাড়িকে বংশানুক্রমে পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা প্রাণধর্ম্মের বিরুদ্ধ। পুরানো বাড়ি আপন যুগ পেরতে না পেরতে পোড়ো বাড়ি হোতে বাধ্য। পিতৃপুরুষের অপব্যয়কে উপেক্ষা ক'রে নতুন বংশ নতুন পাড়ায় গিয়ে বাসা করে। আশ্চর্য্য এই যে, সেও ভাবী ভগ্নাবশেষ সৃষ্টি করবার জন্যে দশপুরুষের মাপে অচল ভিৎ বানাতে থাকে। অর্থাৎ মরে গিয়েও সে ভাবী কালকে জুড়ে আপন বাসায় বাস করবে এই কল্পনাতেই মুগ্ধ। আমার মনে হয়, যে সব ইমারৎ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে নয়, স্থায়িত্বকামী স্থাপত্য তাদেরই সাজে।

কিছুদূরে গিয়ে আবার সেই শূন্য শুষ্ক ধরণী, গেরুয়া চাদরে ঢাকা তার নিরলঙ্কৃত নিরাসক্তি। মধ্যাহ্নে গিয়ে পৌঁছলুম দেলিজান-এ। ইস্ফা-হানের গবর্ণর এখানে তাঁবু ফেলে আমাদের জন্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। এই তাঁবুতে আমাদের আহার হোলো। কুমসহর এখান

থেকে আরো কতকটা দূরে। তার পাশ দিয়ে আমাদের পথ। দূর থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় স্বর্ণমণ্ডিত তার বিখ্যাত মসজিদের চূড়া।

বেলা পাঁচটার সময় গাড়ি পৌঁছল তেহেরানের কাছাকাছি। সুরু হোলো তার আস্ত পরিচয়। নগর প্রবেশের পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুগের শৃঙ্গধ্বনিমুখর নকিবের মতো দেখা গেল একটা কারখানা ঘর,—এটা চিনির কারখানা। এরি সংলগ্ন বাড়িতে জরথুস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের একদল লোক আমাকে অভ্যর্থনার জন্য নাবালেন। ক্লান্তদেহের খাতিরে দ্রুত ছুটি নিতে হোলো। তারপরে তেহেরানের পৌরজনদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে একটি বৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশ কর্‌লেম। এখানকার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন সভাপতি। এখানে চা খেয়ে স্বাগত সম্ভাষণের অনুষ্ঠান যখন শেষ হোলো সভাপতি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি বৃহৎ বাগান বাড়িতে। নানা বর্ণ ফুলে খচিত তার তৃণ আস্তরণ। গোলাপের গন্ধমাধুর্য্যে উচ্ছ্বসিত তার বাতাস, মাঝে মাঝে জলাশয় এবং ফোয়ারা এবং স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুশ্রেণীর বিচিত্র সমাবেশ। যিনি আমাদের জন্যে এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেছেন তাঁকে যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর্‌ব এমন সুযোগ পাইনি। তাঁরি একজন আত্মীয় আগা আসাদি আমাদের শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন। সেই ন্যুয়র্কের কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট, আমার সমস্ত ইংরেজি রচনার সঙ্গে সুপরিচিত। অভ্যাগতবর্গের সঙ্গে আমার কথোপকথনের সেতুস্বরূপ ছিলেন ইনি।

কয়েকদিন হোলো ইরাকের রাজা ফইসল এখানে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে এখানকার সচিবেরা অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ অপরাহ্নের মৃদু রৌদ্রে বাগানে যখন ব'সে আছি ইরাকের দুইজন রাজদূত আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন। রাজা ব'লে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ

করতে ইচ্ছা করেন। আমি তাঁদের জানালেম, ভারতবর্ষে ফেরবার পথে বোগদাদে রাজার দর্শন নিয়ে যাব।

আজ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সঙ্গীত শুনলুম। একটি সুর বাজালেন আমাদের ভৈরোঁ রামকেলির সঙ্গে প্রায় তাব কোনো তফাৎ নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন, তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে আমার মনের মধ্যে মাধুর্য্য নিবিড় হয়ে উঠ্‌ল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ কিন্তু ব্যবসাদার নন। ব্যবসাদারীতে নৈপুণ্য বাড়ে কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়, ময়রা যে কারণে সন্দেশের রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। মানুষের নাক যদি আপন মর্য্যাদা পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার দিকে এগোতে থাকে, তার ঘাড়টা যদি জিরাফের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে মরীয়া হয়ে মেতে ওঠে; তাহোলে সেই আতিশয্যে বস্তু-গৌরব বাড়ে, রূপ-গৌরব বাড়ে না। সাধারণত আমাদের সঙ্গীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেকস্থলে সামান্য একটু আধটু হেরফের করা পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে রূপ নষ্ট হয়। তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাঘরা এবং ওড়না পরানোর মতো। সেই ওড়না বহুমূল্য হোতে পারে তবু রূপকে অতিক্রম করবার স্পর্দ্ধা তাকে মানায় না। এ রকম অদ্ভুত রুচিবিকারের কারণ এই যে, ওস্তাদেরা স্থির ক'রে রেখেছেন সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা নয়, রাগ্‌-রাগিণীকেই বীরবিক্রমে আলোড়িত ফেনিল ক'রে

তোলা,—সঙ্গীতের ইমারতটিকে আপন ভিত্তিতে সুসংযমে দাঁড় করানো নয়, ইঁট কাঠ চুণ সুরকিকে কণ্ঠ কামানের মুখে সগর্জ্জনে বর্ষণ করা। ভুলে যায় সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পর্য্যাপ্তি। গান যে বানায় আর গান যে করে উভয়ের মধ্যে যদি বা দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টি-শক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তাঁর জীবসৃষ্টিতে নিজে কেবল যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার তার উপর ভার থাকত কঙ্কালে যত খুসি মেদমাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্ত্তার কাঁধের উপর চ'ড়ে ব্যায়ামকর্ত্তার বাহাদুরি প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন ভালো তো লাগে। কিন্তু পেটুকের ভালোলাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরি করে মিষ্টান্নের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে নিজেই জুগিয়ে দেয়। পরি-বেষণকর্ত্তা মিষ্টান্ন গড়তে পারে না কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের, তা হোক গে, তবু সেই লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।

ইতিমধ্যে একজন সেকেলে ওস্তাদ এসে আমাকে বাজনা শুনিয়ে গেছেন তার থেকে বুঝলুম এখানেও গানের পথে সন্ধ্যা হয় এবং বাঘের ভয় ঘটে। এখানেও যে খুসি সরস্বতীর বীণায় রবারের তার চড়িয়ে তাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে টেনে টেনে দীর্ঘ করতে পারে।

আজ পারস্যরাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হোলো। প্রাসাদের বৃহৎ কার্পেট-পাতা ঘরে আসবাব আড়ম্বর নেই বল্‌লেই হয়। রাজার গায়ে খাকীরঙের সৈনিক পরিচ্ছদ। অতি অল্পদিন মাত্র হোলো অতি দ্রুত হস্তে পারস্যরাজত্বকে দুর্গতির তলা হতে উদ্ধার ক'রে ইনি তার

হৃদয় অধিকার করে বসে আছেন। এমন অবস্থায় মানুষ আপন সদ্যঃ প্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অতিমাত্র সমারোহ দ্বারা ঘোষণা করবার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ইনি আপন রাজমহিমাকে অতি সহজেই ধারণ করে আছেন। খুব সহজ মহত্ত্বের মানুষ; এঁর মুখের গড়নে প্রবল দৃঢ়তা, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্ন ঔদার্য্য। সিংহাসনে না ছিল তাঁর বংশগত অধিকার,না ছিল আভিজাত্যের দাবী তবু যেমনি তিনি রাজাসনে বসলেন অমনি প্রজার হৃদয়ে তাঁর স্থান অবিলম্বে স্বীকৃত হোলো। দশ বছর মাত্র তিনি রাজা হয়েছেন কিন্তু সিংহাসনের চারিদিকে আশঙ্কা উদ্বেগের দুর্গম বেড়া সতর্কতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠেনি। সেদিন অমিয় দেখে এসেছেন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্চে, রাজা স্বয়ং পথে দাঁড়িয়ে বিনা আড়ম্বরে পরিদর্শনে নিযুক্ত।

ইতিমধ্যে একদিন প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হোলো। তাঁকে বললুম ঃ—বহুযুগের উগ্র সংস্কারকে নম্র ক'রে দিয়ে তাঁরা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিকে নির্ব্বিষ করেছেন এই দেখে আমি আনন্দিত।

তিনি বল্লেন, যতটা আমাদের ইচ্ছা ততটা সফলতা এখনো পাইনি। মানুষ তো আমরা সকলেই, আমাদের মধ্যে মানুষোচিত সম্বন্ধ সহজ ও ভদ্র না হওয়াই অদ্ভুত।

আমি যখন বললুম, পারস্যের বর্ত্তমান উন্নতিসাধনা একদিন হয়তো ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থল হোতে পারে। তিনি বল্লেন, রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। মনে রাখতে হবে, পারস্যের জনসংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটির উপর—এবং সেই ত্রিশ কোটি বহুভাগে বিভক্ত। পারস্যের সমস্যা অনেক বেশি সরল কেননা আমরা জাতিতে ধর্ম্মে ভাষায় এক। আমাদের প্রধান কাজ হচ্চে শাসন ব্যবস্থাকে নির্দ্দোষ এবং সম্যক উপযোগী ক'রে তোলা।

আমি বললুম, দেশের প্রকাণ্ড আয়তনটাই তার প্রকাণ্ড শত্রু। চীন ভারতবর্ষ তার প্রমাণ। জাপান ছোটো ব'লে এত শীঘ্র বড়ো হয়েছে। স্বভাবতই ঐক্যবদ্ধ অন্য সভ্যদেশের রাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষে খাটবে না। এখানকার বিশেষ নীতি নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এখানেই উদ্ভাবিত হবে।

তিনি চলে গেলে আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঐক্যটাই আমাদের দেশে প্রথম ও সব চেয়ে বেশি চাই অথচ ঐটের বাধা আমাদের হাড়ে হাড়ে। ভারতীয় মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন ক'রে বাঁধে, বাইরেকে দূরে ঠেকায়, হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপরেও বাইরের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই দুই বিপরীতধর্ম্মী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের দেশ। এ যেন দুই যমজ ভাই পিঠে পিঠে জোড়া; এক-জনের পা ফেলা আরেকজনের পা ফেলাকে প্রতিবাদ করতেই আছে। দুইজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না; সম্পূর্ণ এক করাও অসাধ্য।

কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা জাতির নানা ধর্ম্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দ্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্যপথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে?

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আলো পাব কী উপায়ে তাকে কেউ উত্তর দেয়, চকমকি ঠুকে, কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বেলে। সেই সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাদের সহজ বুদ্ধি তারা বলে দরজা খুলে দাও। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো এইটেই হোলো পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচার-

বিচারের কড়াকড়ি, সেখানে ধার্ম্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে সুরু ক'রে গলাকাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উদ্যম ফুরোয় নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিল না।

৮

আজ ৫ই মে তেহেরানের জনসভায় আমার প্রথম বক্তৃতা।

সভা ভঙ্গ হোলে আমাদের নিয়ে গেল এখানকার একজন সঙ্গীতগুণীর বাড়িতে। ছোটো একটি গলির ধারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলুম। শান-বাঁধানো চৌকো উঠোন, তারি মধ্যে একটুখানি জলাশয়, গোলাপ ধরেছে গাছে, ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সামনে দালান, সেখানে বাজিয়ের দল অপেক্ষা করছে; বাজনার মধ্যে একটি তার যন্ত্র, একটি বাঁশি, বাকি অনেকগুলি বেহালা। আমরা সেখানে আসন নিলে পর প্রধান গুণী বল্লেন, আমি জানি আপনি ইচ্ছা করেন দেশপ্রচলিত কলাবিদ্যার স্বরূপ নষ্ট না হয়। আমরাও তাই চাই। সঙ্গীতের স্বদেশী স্বকীয়তা রক্ষা ক'রে আমরা তার সঙ্গে য়ুরোপীয় স্বরসঙ্গতিতত্ত্ব যোগ করতে চেষ্টা করি।

আমি বল্লুম, ইতিহাসে দেখা যায় পারসিকদের গ্রহণ করবার প্রবলশক্তি আছে। এসিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের মিশ্রণ চল্‌ছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙের তফাৎটা থেকে যায়, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে যদি সে

মিলনে প্রাণশক্তি থাকে—কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটছে, সঙ্গীতেও কেন ঘটবে না তা বুঝিনে। যে-চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চ্চা প্রাচ্য শিক্ষিতসমাজে যে-পরিমাণে অনেকদিন ধ'রে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে য়ুরোপীয় সঙ্গিতচর্চ্চাও যদি তেমনি হোত তাহোলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সঙ্গীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হোত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য-চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে; এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর প্রবলতর হয়।

তারপরে তিনি একলা একটি সুর তাঁর তারযন্ত্রে বাজালেন। সেটি বিশুদ্ধ ভৈরবী, উপস্থিত সকলেরই সেটি অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করল। ইনি বল্‌লেন, জানি, এরকম সুর আমাদেরকে একভাবে মুগ্ধ করে, কিন্তু অন্যরকম জিনিষটারও বিশেষ মূল্য আছে। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা জন্মিয়ে দিয়ে একটার খাতিরে অন্যকে বর্জ্জন করা নিজের লোকসান করা।

কী জানি, লোকটির যদি শক্তি থাকে তবে পারসিক সঙ্গীতে ইনি যে নূতন বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন করছেন ক্রমে হয়তো কলারাজ্যে তা লাভের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের রাগরাগিণী স্বরসঙ্গতিকে স্বীকার ক'রেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর ক'রে কে বল্‌তে পারে। সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ কোনো একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারি নে। কিন্তু সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্ত্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন,

তেমনি তার সঙ্গীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।

আজ ছয়ই মে। য়ুরোপীয় পঞ্জিকার মতে আজ আমার জন্মদিন। আমার পারসিক বন্ধুরা এই দিনের উপর সকালবেলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আমার চারিদিক ভরে গেছে নানাবর্ণের বসন্তের ফুলে, বিশেষত গোলাপে। উপহারও আসছে নানারকমের। এখানকার গবর্মেণ্ট থেকে একটি পদক ও সেই সঙ্গে একটি ফর্মান পেয়েছি; বন্ধুদের বললুম, আমি প্রথম জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। তারপরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার ক'রে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্ব্বদেশের, —আমি দ্বিজ।

অপরাহ্ণে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর বাড়িতে চায়ের মজলিশে নিমন্ত্রণ ছিল। সে সভায় এ দেশের প্রধানগণ ও বিদেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন পারসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে কথা উঠল, বহুকাল থেকে বারম্বার বিদেশী আক্রমণ-কারীদের—বিশেষত মোগল ও আফগানদের—হাত থেকে অতি নিষ্ঠুর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও পারস্য যে আপন প্রতিভাকে সজীব রেখেছে এ অতি আশ্চর্য্য। তিনি বললেন,—সমস্ত জাতিকে আশ্রয় ক'রে পারস্যে যে ভাষা ও সাহিত্য বহমান তারি ধারাবাহিকতা পারস্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অনাবৃষ্টির রুদ্রতা যখন তাকে বাইরে থেকে পুড়িয়েছে তখন তার অন্তরের সম্বল ছিল তার আপন নদী। এতে শুধু যে পারস্যের আত্ম-স্বরূপকে রক্ষা করেছে তা নয়, যারা পারস্যকে মারতে এসেছিল তারাই

পারস্তের কাছ থেকে নূতন প্রাণ পেলে—আরব থেকে আরম্ভ ক'রে মোগল পর্য্যন্ত।

আরবরা তুর্কিরা মোগলরা এসেছিল দানশূন্য হস্তে, কেবলমাত্র অস্ত্র নিয়ে। আরব পারস্যকে ধর্ম্ম দিয়েছে কিন্তু পারস্য আরবকে দিয়েছে আপন নানাবিদ্যা ও শিল্পসম্পন্ন সভ্যতা। ইস্‌লামকে পারস্য ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তুলেছে।

৭ মে। আজ সকালে প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। প্রকাণ্ড বড়ো বৈঠকখানা, স্ফটিকে মণ্ডিত, কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে। মন্ত্রী বৃদ্ধ; আমারি সমবয়সী। আমি তাঁকে বললুম ভারতবর্ষের আবহাওয়া আমাদের জীবনযাত্রার উপরে এখানকার চেয়ে অনেক বেশি মাশুল চড়িয়েছে। তিনি বললেন বয়সের উপর কালের দাবী তত বেশি লোকসান করে না যেমন করে আহারে ব্যবহারে অনিয়ম অসংযম। সাবেককালে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসগুলি ছিল আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই, এখন বিদেশী নতুন অভ্যাস এসে অসামঞ্জস্য ঘটিয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই।

ঘরে কার্পেট পাতা আমাদের চিরকালের অভ্যাস, তারি সঙ্গে জুড়ি অভ্যাস হচ্চে জুতো খুলে ঘরে ঢোকা। আজকাল য়ুরোপীয় প্রথামতো পথের জুতোটাকে ধূলোসুদ্ধ ঘরের মধ্যে টেনে আনি। কার্পেট হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। আগে কার্পেট-পাতা মেঝের উপর বসতুম, এখন সোফা কেদারার খাতিরে বহুমূল্য বহুবিচিত্র কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদদলিত ক'রে।

এখান থেকে গেলেম পার্লামেণ্টের সভানায়কের বাড়িতে। এঁরা চিন্তাশীল শিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক, এঁদের সঙ্গে কথা কইবার বিষয় অনেক আছে কিন্তু কথা চলে না। তর্জ্জমার ভিতর দিয়ে আলাপ করা

পায়ে পায়ে কোদালি দিয়ে পথ কেটে চলার মতো। যিনি আমার কালকেকার কবিতা পারসিক ভাষা ও ছন্দে তর্জ্জমা করেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা হোলো। লোকটি হাসিখুসি, গোলগাল, হৃদ্যতায় সমুচ্ছ্বসিত। কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবল কণ্ঠে, প্রবল উৎসাহে দেহচালনা করেন। ওখান থেকে চলে আস্‌বার সময় সভাপতি মশায় অতি সুন্দর লিপিনৈপুণ্যে লিখিত কবি আনওয়ারির রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন।

রাত্রে গেলেম থিয়েটারে অভিনয় দেখ্‌তে। নাটক ও নাট্যাভিনয় পারস্যে হালের আমদানি। এখনো লোকের মনে ভালো ক'রে বসে নি। তাই সমস্ত ব্যাপারটা কাঁচা রকমের ঠেক্‌ল। শাহ্‌নামা থেকে নাটকের গল্পটি নেওয়া। আমাদের দেশের নাটকের মতো প্রায়ই মাঝে মাঝে গান, এবং বোধ করি দেশাভিমানের উচ্ছ্বাস। মেয়েদের ভূমিকা অধিকাংশই মুসলমান মেয়েরা নিয়েছে দেখে বিস্ময় বোধ হোলো।

অপরাহ্নে জরথুস্ত্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান। সেখান থেকে কর্ত্তব্য সেরে ফিরে যখন এলুম তখন আমাদের বাগানে গাছের তলায় একটি জলাশয়ের চারধারে বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করছে। এখানকার সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণে সকলে আহূত। আমার তরফে ছিল সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতার ধারা, আর এঁদের তরফে ছিল তারই মাঝে মাঝে এপারে ওপারে পারসিক ভাষার সাঁকো বেঁধে দেওয়া।

পথিকের মতো পথ চল্‌তে চল্‌তে আমি আজ এখানকার ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি। সম্পূর্ণ ক'রে কিছু দেখ্‌বার সময় নেই। আমার মনে যে ধারণাগুলো হচ্চে সে দ্রুত আভাসের ধারণা। বিচার ক'রে উপলব্ধি নয়, কেবলমাত্র মানসিক হাত বুলিয়ে যাবার অনুভূতি।

এই যেমন, সেদিন একজন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ অল্পক্ষণের আলাপ হোলো। একটা ছায়াছবি মনে র'য়ে গেল সেটা নিমেষকালের আলোতে তোলা। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক। সৌম্য তাঁর মূর্ত্তি, মুখে স্বচ্ছচিত্তের প্রকাশ। এঁর বেশ মোল্লার, কিন্তু এঁর বুদ্ধি সংস্কারমোহমুক্ত, ইনি আধুনিক অথচ চিরকালের পারসিক। ক্ষণকালের দেখাতেই এই মানুষের মধ্যে আমি পারস্যের আত্মসমাহিত স্বপ্রকৃতিস্থ মূর্ত্তি দেখ্‌লুম, যে-পারস্যে একদা আবিসেন্না ছিলেন বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধক, এবং জালালউদ্দিন গভীরতম আত্মোপলব্ধিকে সরসতম সঙ্গীতে প্রবাহিত করেছিলেন। অধ্যাপক ফেরুঘির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তিনিও আমার মনে একটি চিত্র এঁকে দিয়েছেন, সে চিত্রও চিত্তবান পারসিকের। অর্থাৎ এঁর স্বদেশীয় স্বভাব বিদেশীর কাছেও সহজে প্রকাশমান। যে মানুষ সঙ্কীর্ণভাবে একান্তভাবে স্বাদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ, তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না—কেননা মূর্ত্তি আপন দেশের মাটিতে গড়া হোলেও যে আলো তাকে প্রকাশ করবে সে আলো যে সার্ব্বভৌমিক।

তেহেরান থেকে বিদায় নেবার দিন এল, প্রধান মন্ত্রীবর্গ এসে আমাকে বিদায় দিলেন।

৯

বেলা আড়াইটার সময় যাত্রা করলুম। তেহেরান থেকে বেরিয়ে প্রথমটা পারস্যের নীরস নির্জ্জন চেহারা আবার দেখা দিল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দৃশ্য পরিবর্ত্তন হোলো। ফসলে সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে তরু-

সংহতি, যেখানে সেখানে জলের চঞ্চল ধারা, মেটে ঘরের গ্রাম তেমন বিরল নয়। দিগন্তে বরফের আঙুল-বুলানো গিরিশিখর।

সূর্য্যাস্তের সময় কাজবিন সহরে পৌঁছলুম। এখানে একটি হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথের প্রধান জংসন যেমন আসানসোল, এখানে নানা পথের মোটরের সঙ্গমতীর্থ তেমনি কাজবিন।

কাজবিন সাসানীয় কালের সহর, দ্বিতীয় শাপুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় সাফাবি রাজা তামাস্প এই সহরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লির পলাতক মোগল বাদশা হুমায়ুন দশ বৎসর কাল এখানে তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন।

সাফাবি বংশের বিখ্যাত শা আব্বাসের সঙ্গে এণ্টনি ও রবার্ট শার্লি নামক দুই ইংরেজ ভ্রাতার এইখানে দেখা হয়। জনশ্রুতি এই যে এঁরাই কামান প্রভৃতি অস্ত্র সহযোগে আধুনিককালীন যুদ্ধবিদ্যায় বাদশাহের সৈন্যদের শিক্ষিত করেন। যাই হোক বর্ত্তমানে এই ছোটো সহরটিতে সাবেক কালের রাজধানীর মর্য্যাদা কিছুই চোখে পড়ে না।

ভোরবেলা ছাড়লুম হামাদানের অভিমুখে। চড়াইপথে চল্‌ল আমাদের গাড়ি। দুইধারে ভূমি সুজলা সুফলা, মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গ্রাম, আঁকাবাঁকা নদী, আঙুরের ক্ষেত, আফিমের পুষ্পোচ্ছ্বাস। বেলা দুপুরের সময় হামাদানে পৌঁছিয়ে একটি মনোহর বাগানবাড়ির মধ্যে আশ্রয় পাওয়া গেল,—পপ্‌লার তরুসঙ্ঘের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্চে বরফের আঁচড়কাটা পাহাড়।

তেহেরানে গরম পড়তে আরম্ভ করেছিল, এখানে ঠাণ্ডা। সমুদ্রের উপরিতল থেকে এ সহর ছ হাজার ফুট উঁচু। এল্‌ভেন্দ পাহাড়ের পাদদেশে এর স্থান। একদা একেমেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল

এইখানে। সেই রাজধানীর প্রাচীন নাম ইতিহাসবিখ্যাত একবাতানা, আজ তার ধ্বংসাবশেষ প্রায় কিছু বাকি নেই।

আহার ও বিশ্রামের পর বিকেল বেলা সহর দেখতে বেরলুম। প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল, ঘন বনের মধ্য দিয়ে গলিপথ বেয়ে একটি পুরোনো বড়ো ইমারতের সামনে। বল্লে, এর উপরের তলা থেকে চারদিকের দৃশ্য অবারিত দেখতে পাওয়া যায়। আমার সঙ্গীরা দেখতে গেলেন কিন্তু আমার সাহস হোলো না। গাড়িতে বসে দেখতে লাগলুম একদল লোক এসেছে বনের ধারে চড়িভাতি করতে। মেয়েরাও তার মধ্যে আছে,—তারা কালো চাদরে মোড়া, কিন্তু দেখছি বাইরে বেরোতে রাস্তায় ঘাটে বেড়াতে এদের সঙ্কোচ নেই।

আজ মহরমের ছুটি, সবাই ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েছে। অল্প কয়েক বছর আগে মহরমের ছুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠত, আত্মপীড়নের তীব্রতায় মারা যেত কত লোক। বর্ত্তমান রাজার আমলে ধীরে ধীরে তীব্রতা কমে আসছে।

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে সহরে গেলেম। আজ দোকান বাজার বন্ধ কিন্তু ছুটির দলের খুব ভিড়। পারস্যে এসে অবধি মানুষ কম দেখা আমাদের অভ্যাস, তাই রাস্তায় এত লোক আমাদের চোখে নতুন লাগল। আরো নতুন লাগ্‌ল এই সহরটি। সহরের এমন চেহারা আর কোথাও দেখিনি। মাঝখান দিয়ে একটি অপ্রশস্ত খামখেয়ালি ঝর্‌না নানা ভঙ্গীতে কলশব্দে বহমান,—কোথাও বা উপর থেকে নিচে পড়ছে ঝরে, কোথাও বা তার সমতলীন স্রোত রৌদ্রে ঝলমল করছে, ধারে ধারে পাথরের স্তূপ, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো সাঁকো এপার থেকে ওপারে; ঝর্‌নার সঙ্গে পথের আঁকাবাঁকা মিল; মানুষের কাজের সঙ্গে প্রকৃতির গলাগলি; বাড়ির সামিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণগুলি উপরের থাকে,

নিচের থাকে, এ-কোণে ও-কোণে। তারি নানা জায়গায় নানা দল বসে গেছে: বাঁকাচোরা রাস্তায় মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, এমন কি, মোটরবাস্ ভর্ত্তি করে চলেছে সব ছুটি-সম্ভোগীর দল। গাড়ির ঘোড়াগুলি সুশ্রী সুপুষ্ট। এই ছুটির পরবে মত্ততা কিছুই দেখলুম না, চারিদিকে শান্ত আরামের ছবি এখানকার অরণ্য পর্ব্বত ঝর্‌ণার সঙ্গে মিশে গেছে।

গবর্ণর কাল সহরের বাইরে বনের মধ্যে বিকেলে আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাঁ-ধারে পাহাড়, ডাইনে ঘন অরণ্যের অন্ধকার ছায়ায় ঝর্‌না ঝরে পড়ছে। পাহাড়ী পথ বেয়ে বহু চেষ্টায় মোটর গেল। সেই বহুযুগের মেষপালকদের ভেড়া-চরা বনের মধ্যে চা খেয়ে সন্ধ্যা-বেলায় বাসায় ফিরে এলুম। হামাদানের যে মূর্ত্তি চিরসজীব, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেখানে বুলবুল গান ক'রে আসছে, আলেকজাণ্ডারের লুঠের বোঝার সঙ্গে সে অন্তর্ধান করে নি কিন্তু পথের ধারে প্রান্তরের মধ্যে অনাদরে পড়ে আছে একটি পাথরের পিণ্ড, সম্রাটের সিংহদ্বারের সিংহের এই অপভ্রংশ।

স্নানাহার সেরে দুপুরের পর হামাদান থেকে রওনা হলুম। যেতে হবে কির্ম্মিনশা। তখন ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়িয়েছে, আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এল। চলেছি আসাদাবাদ গিরিপথ দিয়ে। দুই ধারে সবুজ ক্ষেত ফসলে ভরা, মাঝে মাঝে বনভূমি জলস্রোতে লালিত। মাঠে ভেড়া চরছে। পাহারগুলো এগিয়ে এসে তাদের শিলাবক্ষপট প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে। থেকে-থেকে এক-এক পসলা বৃষ্টি নেমে ধুলোকে দেয় পরাভূত ক'রে। আমার কেবল মনে পড়েছিল "মেঘৈমের্দুরমম্বরম্বনভুবঃশ্যামাঃ"— তমালদ্রুমে নয়, কী গাছ ঠিক জানিনে, কিন্তু এই মেঘলা দিনে উপস্থিত-মতো ওকে তমালগাছ বলতে দোষ নেই।

আমরা যে পথ দিয়ে চলেছি এরি কাছাকাছি কোনো এক

জায়গায় বিখ্যাত নিহাবন্দের রণক্ষেত্রে সাসানীয় সাম্রাজ্য আরবদের হাতে লীলা সমাপন করে। সেইদিন বহুকালীন প্রাচীন পরস্তের ইতিহাসে হঠাৎ সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় সুরু হোলো।

অবশেষে আমাদের রাস্তা এসে পড়ল বেহিস্তুনে। এখানে শৈলগাত্রে দরিয়ুসের কীর্ত্তিলিপি পারসিক সুসীয় ও ব্যাবিলোনীয় ভাষায় খোদিত। এই খোদিত ভাষার উর্দ্ধে দরিয়ুসের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির সামনে বন্দীবেশে দশজন বিদ্রোহীর প্রতিরূপ। এরা তাঁর সিংহাসন অধিরোহণে বাধা দিয়েছিল। দরিয়ুসের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ক্যাম্বাইসিস (পারসিক উচ্চারণ কাম্বোজিয়) ঈর্ষাবশত গোপনে তাঁর ভ্রাতা স্মর্দিস্‌কে হত্যা করিয়েছিলেন। যখন তিনি ইজিপ্ট অভিযানে তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে সৌমতে ব'লে এক ব্যক্তি নিজেকে স্মর্দিস্ নামে প্রচার ক'রে সিংহাসন দখল ক'রে বসে। ক্যাম্বাইসিস্ ইজিপ্ট থেকে ফেরবার পথে মারা যান। তখন একেমেনীয় বংশের অপর শাখাভুক্ত দরিয়ুস ছদ্মরাজাকে পরাস্ত ক'রে বন্দী করেন। প্রতিমূর্ত্তিতে ভূমিশায়ী সেই মূর্ত্তির বুকে দরিয়ুসের পা, বন্দী উর্দ্ধে দুই হাত তুলে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। দরিয়ুসের মাথার উপরে অহুরমজ্দার মূর্ত্তি।

অধ্যাপক হর্ট্জ্‌ফেল্ড্ বলেন সম্প্রতি একটি শিলালিপি বেরিয়েছে তাতে দরিয়ুস জানাচ্চেন তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর পিতা পিতামহ উভয়েই বর্ত্তমান। এই প্রথাবিরুদ্ধ ব্যাপার কী ক'রে সম্ভব হোলো তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের মাঝে মাঝে এক একটা দ্বীপ দেখা যায় যা ভূমিকম্পের হাতে তৈরি। তার সর্ব্বত্র গলিতধাতু আর অগ্নিস্রাবের চিহ্ন। তেমনি বহুযুগ ধ'রে ইতিহাসের ভূমিকম্পে এবং অগ্নিউদ্গীরণে পারস্তের জন্ম। প্রাচীনকাল থেকে পারস্যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে। মানুষের

ইতিহাসে সব চেয়ে পুরাতন মহাসাম্রাজ্য সাইরাস্ স্থাপন করেন, তার পরেও দীর্ঘকাল পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব। তার প্রধান কারণ পারস্যের চারদিকেই বড়ো বড়ো প্রাচীন রাজশক্তির স্থান। হয় তাদের সকলকে দমন ক'রে রাখতে হবে, নয় তাদের কেউ না কেউ এসে পারস্যকে গ্রাস করবে। নানাজাতির সঙ্গে এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকেই পারস্যের ঐতিহাসিক বোধ ঐতিহাসিক সত্তা এত প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ সমাজ সৃষ্টি করেছে, মহাজাতীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেনি। আর্য্যের সঙ্গে অনার্য্যের দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ সামাজিক। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য্য বহুসংখ্যক অনার্য্যের মাঝখানে প'ড়ে নিজের সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, রাষ্ট্রজয়ের নয়, সমাজরক্ষার,—সীতা সেই সমাজনীতির প্রতীক। রাবণ সীতাহরণ করেছিল রাজ্য হরণ করেনি। মহাভারতেও বস্তুত সমাজনীতির দ্বন্দ্ব—এক পক্ষ কৃষ্ণকে স্বীকার করেছে, কৃষ্ণাকে পণ রেখে তাদের পাশা খেলা, অন্য পক্ষ কৃষ্ণকে অস্বীকার ও কৃষ্ণাকে করেছে অপমান। শাহ্‌নামায় আছে প্রকৃত ইতিহাসের কথা, রাষ্ট্রীয় বীরদের কাহিনী, ইরাণীদের সঙ্গে তাতারীদের বিরোধ। তাতে ভগবদ্গীতার মতো তত্ত্বকথা বা শান্তিপর্ব্বের মতো নীতি উপদেশ প্রাধান্য পায় নি।

পারস্য বারবার পরজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন পারসিক ঐক্যকে দৃঢ় করবার ও জয়ী করবার চেষ্টা করেছে। গুপ্তরাজাদের আমলে ভারতবর্ষ একবার আপন সাম্রাজ্যিক একসত্তা অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হয় নি। তার প্রধান কারণ ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্য্যে অনার্য্যে বিভক্ত, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত পাততে পারেনি। দরিয়ুস শিলাবক্ষে এমনভাবে আপন জয়ঘোষণা করেছেন যাতে চিরকাল তা

স্থায়ী হয়। কিন্তু এই জয়ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক,—দরিয়ুস পারসিক রাষ্ট্রসত্তার জন্যে বৃহৎ আসন রচনা করেছিলেন,—যেমন সাইরসকে তেমনি দরিয়ুসকে অবলম্বন ক'রে পারস্য আপন অখণ্ড মহিমা বিরাট ভূমিকায় অনুভব করতে পেরেছিল। পারস্যে পর্ব্বে পর্ব্বে এই রাষ্ট্রিক উপলব্ধি পরাভবকে অতিক্রম ক'রে জেগেছে, আজও আবার তার জাগরণ হোলো। এখানকার প্রধান মন্ত্রী আমাকে যা বলেছিলেন তার মূল কথাটা হচ্চে এই যে, আপন সমাজনিহিত দুর্ব্বলতার কারণ দূর করাই ভারতবর্ষের সমস্যা, আর পারস্যের সমস্যা আপন শাসনব্যবস্থার অপূর্ণতা মোচন করা। পারস্য সেই কাজে লেগেছে ভারতবর্ষ এখনো আপনার যথার্থ কাজে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লাগে নি।

বেহিস্তুন থেকে বেরলুম। অদূরে তাকিবুস্তানের পাহাড়ে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি। সহর থেকে মাইল চারেক দূরে। গবর্ণরের দূত এসে পথের মধ্যে থেকে সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। দূরে থেকেই দেখা যায় অগভীর গুহাগাত্রে খোদাই-করা মূর্ত্তি, তার সামনে কৃত্রিম সরোবরে ঝরে পড়ছে জলস্রোত। দুটি মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে, পায়ের তলায় দলিত একজন বন্দী। কোনো লেখা পাওয়া যায় না কিন্তু সাজসজ্জায় বোঝা যায় এরা সাসানীয়। পাহাড়ের মধ্যে খোদাই-ক'রে তোলা একটি গম্বুজাকৃতি কক্ষের ঊর্দ্ধভাগে বাম হাতে অভিষেকের পাত্র ও ডান হাতে মালা নিয়ে পাখা মেলে বিজয়দেবতা দাঁড়িয়ে—তার নিচে এক দাঁড়ানো মূর্ত্তি এবং তার নিচে বর্ম্মপরা অশ্বারোহী। পাশের দেয়ালে শিকারের ছবি। এই মূর্ত্তিগুলিতে আশ্চর্য্য একটি শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, দেখে মন স্তম্ভিত হয়।

সাসানীয় যুগ বলতে কী বোঝায় সংক্ষেপে ব'লে রাখি।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে একেমেনীয় রাজত্বের অবসান হোলে

পরে যে-জাত পারস্যকে দখল করে তাদের বলে পার্থীয়। তারা সম্ভবত শকজাতীয়, প্রথমে গ্রীকদের প্রভাবে আসে পরে তারা পারসিক সভ্যতা গ্রহণ করে। অবশেষে ২২৬ খৃষ্টাব্দে সাসান-এর পৌত্র অর্দশীর পার্থীয় রাজার হাত থেকে পারস্যকে কেড়ে নিয়ে আর একবার বিশুদ্ধ পারসিক জাতির সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এঁদের সময়কার প্রবল সম্রাট ছিলেন শাপুর, তিনিই রোমের সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে পরাস্ত ও বন্দী করেন।

একমেনীয়দের ধর্ম্ম ছিল জরথুস্ত্রীয়, সাসানীয়দের আমলে আর একবার প্রবল উৎসাহে এই ধর্ম্মকে জাগিয়ে তোলা হয়।

ঋজু প্রশস্ত নূতন তৈরি পথ বেয়ে আসছি। অদূরে সামনে পাহাড়ের গায়ে কির্ম্মিনশা সহর দেখা দিল। পথের দুইধারে ফসলের ক্ষেত, আফিমের ক্ষেত ফুলে আচ্ছন্ন, মেঘের আড়াল থেকে অস্তসূর্য্য-রশ্মির আভা প'ড়ে সদ্যধৌত গাছের পাতা ঝলমল করছে।

সহরে প্রবেশ করলুম। পরিষ্কার রাস্তার দুইধারে নানাবিধ পণ্যের দোকান। পথের ধূলো মারবার জন্যে ভিস্তিরা মশকে ক'রে জল ছিটচ্চে। সুন্দর বাগানের মধ্যে আমাদের বাসা। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এখানকার গবর্ণর। ঘরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। এই পরিষ্কার সুসজ্জিত নূতন বাড়িটি আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়ে গৃহস্বামী চলে গেছেন।

১০

কির্ম্মিনশা থেকে সকালে যাত্রা ক'রে বেরলুম। আজ যেতে হবে কাস্‌রিশিরিনে—পারস্যের সীমানার কাছে। তার পরে আসবে কানিকিন আরব সীমানার রেলোয়ে ষ্টেশন।

পারস্যে প্রবেশ পথে আমরা তার যে নীরস মূর্ত্তি দেখেছিলুম এখন আর তা নেই। পাহাড়ে রাস্তার দুইধারে ক্ষেত ভরে উঠেছে ফসলে, গ্রামও অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন, চাষীরা চাষ করছে এ দৃশ্যও চোখে পড়ল, তা ছাড়া এই প্রথম গোরু চরতে দেখলুম।

ঘণ্টাদুয়েক পরে সাহাবাদে পৌঁছলুম। এখানে রাজার একটি প্রাসাদ নতুন তৈরি হয়েছে, গবর্ণর সেখানে গাছের ছায়ায় বসিয়ে চা খাওয়ালেন, সঙ্গে চল্‌লেন কেরেন্দ নামক জায়গায় মধ্যাহ্নভোজন করিয়ে আমাদের বিদায় দেবার জন্যে। বড়ো সুন্দর এই গ্রামের চেহারাটি। তরুচ্ছায়া-নিবিড় পাহাড়ের কোলে আশ্রিত লোকালয়, ঝর্‌না ঝরে পড়ছে এদিক ওদিক দিয়ে, পাথর ডিঙিয়ে। গ্রামের দোকানগুলির মাঝখান দিয়ে উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পথ,—কৌতূহলী জনতা জমেছে।

তার পরের থেকে ধরণীর ক্রমেই সেই আবার শুষ্কনৈরাশ্যের মূর্ত্তি। আমরা পারস্যের উচ্চভূমি থেকে নেমে চলেছি। সকলেই ভয় দেখিয়েছিলেন এখান থেকে আমরা অত্যন্ত গরম পাব। তার কোনো লক্ষণ দেখলুম না। হাওয়াটা আমাদের দেশের মাঘ মাসের মতো। পারস্যের শেষ সীমানায় যখন পৌঁছলুম দেখা গেল বোগদাদ থেকে অনেকে এসেছেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কেউ কেউ রাজ-কর্ম্মচারী, কেউ বা খবরের কাগজের সম্পাদক, অনেকে আছেন সাহিত্যিক, তা ছাড়া প্রবাসী ভারতীয়। এঁরা কেউ কেউ ইংরেজি জানেন। একজন আছেন যিনি নিয়ুইয়র্কে আমার বক্তৃতা শুনেছেন। সেখানে শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শেষ ক'রে ইনি এখানকার শিক্ষাবিভাগের কাজে নিযুক্ত। ষ্টেশনের ভোজনশালায় চা খেতে বসলুম। একজন বল্‌লেন, যাঁরা এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছেন। আমরা সকলেই এক।

ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্ম্মের নামে কেন যে এমন বিরোধ সৃষ্টি করছে আমরা একেবারেই বুঝতে পারিনে। ভারতীয়েরাও বলেন এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার লেশমাত্র অভাব নেই। দেখা যাচ্চে ইজিপ্টে তুরুস্কে ইরাকে পারস্যে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্চে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দুর সীমানায়, মুসলমানের সীমানায়। এ কি পরাধীনতার মরুদৈন্যে লালিত ঈর্ষাবুদ্ধি, এ কি ভারতবর্ষের অনার্য্যচিত্তজাত বুদ্ধিহীনতা ?

অভ্যর্থনাদলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কবি ছিলেন, আমার চেয়ে দুই এক বছরের ছোটো। পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, শান্ত স্তব্ধ মানুষটি। তাঁর মুখচ্ছবি ভাবুকতায় আবিষ্ট। ইরাকের মধ্যে ইনিই সব চেয়ে বড়ো কবি ব'লে এঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোলো।

অনেকদিন পরে মোটর ছেড়ে রেলগাড়িতে চড়া গেল। গাড়িগুলি আরামের। দেহটা এতকাল পথে পথে কেবলি ঠোকর খেয়ে নাড়া খেয়ে একদণ্ড নিজেকে ভুলে থাকতে পারছিল না, আজ বাহনের সঙ্গে অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব তার মিটে গেল।

জানালার বাইরে এখনো মাঝে মাঝে ফসলের আভাস দেখা যায়, বোধ হয় যেন কোথাও কোথাও খাল নালা দিয়ে জলসেকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মোটের উপরে কঠিন এখানকার ধূসরবর্ণ মাটি।

মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ষ্টেশনে অভ্যর্থনার জনতা পেরিয়ে এলুম। যখন শোনা গেল বোগদাদ আর পনেরো মিনিট পথ দূরে তখনো তার পূর্ব্বসূচনা কিছুই নেই, তখনো শূন্য মাঠ ধূ ধূ করছে।

অবশেষে বোগদাদে এসে গাড়ি থামল। ষ্টেশনে ভিড়ের অন্ত নেই। নানাশ্রেণীর প্রতিনিধি এসে আমাকে সম্মান জানিয়ে গেলেন, ভারতীয়েরা

দিলেন মালা পরিয়ে। ছোটো ছোটো দুটি মেয়ে দিয়ে গেল ফুলের তোড়া। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে একটি বাঙালি মেয়েকেও দেখলেম। বোগদাদের রাস্তা কতকটা আমাদেরি দেশের দোকানবাজারওয়ালা পথের মতো। একটা বিশেষত্ব আছে, মাঝে মাঝে পথের ধারে কাঠের বেঞ্চি পাতা চা খাবার এবং মেলামেশা করবার জায়গা। ছোটোখাটো ক্লাবের মতো। সেখানে আসর জমেছে। এক এক শ্রেণীর লোক এক একটি জায়গা অধিকার করে থাকে সেখানে আলাপের প্রসঙ্গে ব্যবসার জেরও চলে। সহরের মতো জায়গায় এরকম সামাজিকতা চর্চ্চার কেন্দ্র থাকা বিশেষ আবশ্যক সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে গল্প বলবার কথক ছিল, তখন তারা এই সকল পথপ্রান্তসভায় কথা শোনাত। আমাদের দেশে যেমন কথকের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, এদের এখানেও তাই। এই বিদ্যাটি ছাপার বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলে না। মানুষ আপন রচিত যন্ত্রগুলোর কাছে আপন সহজ শক্তিকে বিকিয়ে দিচ্চে।

টাইগ্রিস নদীর ধারে একটি হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েছে। আমার ঘরের সামনে মস্ত ছাদ, সেখানে বসে নদী দেখা যায়। টাইগ্রিস প্রায় গঙ্গার মতোই প্রশস্ত,—ওপারে ঘন গাছের সার, খেজুরের বন, মাঝে মাঝে ইমারত। আমাদের ডানদিকে নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ চলে গেছে। এই কাঠের ব্রিজ সৈন্য পারাপারের জন্য গত যুদ্ধের সময় জেনেরাল মড অস্থায়ীভাবে তৈরি করিয়েছিলেন।

চেষ্টা করছি বিশ্রাম করতে কিন্তু সম্ভাবনা অল্প। নানারকম অনুষ্ঠানের ফর্দ্দ লম্বা হয়ে উঠেছে। সকালে গিয়েছিলুম ম্যুজিয়ম দেখতে, নূতন স্থাপিত হয়েছে, বেশি বড়ো নয়, একজন জর্ম্মান অধ্যাপক এর অধ্যক্ষ। অতি প্রাচীন যুগের যে সব সামগ্রী মাটির নিচে থেকে

বেরিয়েছে সেগুলি দেখালেন। এ সমস্ত পাঁচ ছয় হাজার বছর আগেকার পরিশিষ্ট। মেয়েদের গহনা, ব্যবহারের পাত্র প্রভৃতি সুদক্ষ হাতে রচিত ও অলঙ্কৃত। অধ্যাপক বলেন এই জাতের কারুকার্য্যে স্থূলতা নেই, সমস্ত সুকুমার ও সুনিপুণ। পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘকালের অভ্যাস না হোলে এমন শিল্পের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হোত না। এদের কাহিনী নেই জানা, কেবল চিহ্ন আছে। এটুকু বোঝা যায় এরা বর্ব্বর ছিল না। পৃথিবীর দিনরাত্রির মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের স্মরণভ্রষ্ট এই সব নরনারীর সুখদুঃখের পর্য্যায় আমাদেরই মতো বয়ে চলত। ধর্ম্মে কর্ম্মে লোকব্যবহারে এদেরও জীবন-যাত্রার আর্থিক পারমার্থিক সমস্যা ছিল বহু বিচিত্র। অবশেষে, কী আকারে ঠিক জানিনে, কোন্ চরম সমস্যা বিরাটমূর্ত্তি নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়াল, এদের জ্ঞানী কর্ম্মী ভাবুক, এদের পুরোহিত এদের সৈনিক এদের রাজা তার কোনো সমাধান করতে পারলে না, অবশেষে ধরণীর হাতে প্রাণযাত্রার সম্বল কিছু কিছু ফেলে রেখে দিয়ে সবাইকে চলে যেতে হোলো। কোথায় গেল এদের ভাষা, কোথায় এদের সব কবি, এদের প্রতিদিনের বেদনা কোনো ছন্দের মধ্যে কোথাও কি সংগ্রহ করা রইল না? কেবলমাত্র আর আট দশ হাজার বছরের প্রান্তে ভাবীকালে দাঁড়িয়ে মানুষের আজকের দিনের বাণীর প্রতি যদি কান পাতি, কোনো ধ্বনি কি পৌছবে কানে এসে, যদি বা পৌছয় তার অর্থ কি কিছু বুঝতে পারব?

আজ অপরাহ্নে আমার নিমন্ত্রণ এখানকার সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। বাগানে গাছের ছায়ায় আমাদের আসন। ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের আয়োজন জনতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত। একে একে নানালোকে তাঁদের অভিনন্দন পাঠ শেষ করলে সেই বৃদ্ধ কবি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলেন। বজ্রমন্দ্র তাঁর ছন্দপ্রবাহ, আর উদ্দাম তাঁর

ভঙ্গী। আমি তাঁদের বললেম এমন কবিতার অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই ; এ যেন উত্তাল তরঙ্গিত সমুদ্রের বাণী, এ যেন ঝঞ্ঝাহত অরণ্য-শাখার উদ্গাথা।

অবশেষে আমার পালা উপস্থিত হোলে আমি বললুম, আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্ব্বে পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব-অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার ক'রে বিদ্যার আকারে ধর্ম্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি আরবসাগর পার ক'রে আরব্যের নববাণী আর একবার ভারতবর্ষে পাঠান,—যাঁরা আপনাদের স্বধর্ম্মী তাঁদের কাছে,—আপনাদের মহৎ ধর্ম্মগুরুর পূজ্যনামে, আপনাদের পবিত্রধর্ম্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্ম্মের অবমাননা থেকে মানুষে মানুষে মিলনের পথে মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।

রাজা আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন নদীর ওপারে তাঁর একটি বাগানবাড়িতে। রাজা একেবারেই আড়ম্বরশূন্য মানুষ, অত্যন্ত সহজ ব্যবহার। খোলা চাতালে আমরা বসলুম, সামনে নিচে বাগান। রাজার ভাইও আছেন তাঁর সঙ্গে। প্রধান মন্ত্রী আছেন,—অল্প বয়স, এখানকার সবাই বলেন, আজ পৃথিবীতে সব চেয়ে অল্প বয়সের মন্ত্রী ইনি। যিনি দোভাষীর কাজ করবেন তিনিও উপস্থিত। রাজা

বললেন ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের যে দ্বন্দ্ব বেধেছে নিশ্চয়ই সেটা ক্ষণিক। যখন কোনো দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বোধন আসে তখন প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের চেষ্টা প্রবল হয়। এই আকস্মিক বেগটা কমে গেলে মন আবার সহজ হয়ে আসে।—আমি বল্লেম আজ তুর্কি ইজিপ্ট পারস্যে নবজাগ্রত জাতির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখলুম, যে-বিশিষ্টতাবোধ সঙ্কীর্ণভাবে আত্মনিহিত ও অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ, সচেষ্টতার সঙ্গেই তার তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, নইলে সেই অন্ধতার দ্বারা জাতির রাষ্ট্রবুদ্ধি অভিভূত হয়। ভারতবর্ষের উদ্বোধনে যদি সেই সর্ব্বজনের হিতজনক শুভবুদ্ধির আবির্ভাব দেখ্‌তে পেতেম তাহোলে নিশ্চিন্ত হতেম। কিন্তু যখন দেখতে পাই হিন্দুমুসলমান উভয় পক্ষেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতী ধর্ম্মান্ধতা প্রবল হয়ে উঠে' রাষ্ট্রসঙ্ঘকে প্রতিহত করছে তখন হতাশ হোতে হয়।

এই বাগানের ধারে চায়ের টেবিলে সহজ বাক্যালাপের মধ্যে সেদিনের ছবি মনে আনা দুরূহ, যেদিন এই রাজা পথশূন্য মরুভূমির মধ্যে বেদুয়িনদের বহু উপজাতিকে আপন নেতৃত্বের অধীনে এক করে নিয়ে জর্ম্মানি ও তুরুষ্কের সম্মিলিত অভিযানকে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। মৃত্যুর মূল্যে কিনেছিলেন জীবনের গৌরব। কঠিন ভীষণ সেই রণপ্রাঙ্গণ, জয়ে পরাজয়ে নিত্য সংশয়িত দুঃসাধ্য সেই অধ্যবসায়। সেই অক্লান্ত রণরঙ্গের অধিনায়ককে দেখলেম। তখনকার মৃত্যুচ্ছায়াক্রান্ত দিনরাত্রির সেই বিভীষিকার মধ্যে তাঁর উষ্ট্রবাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনো একটা স্থান পাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ বসেছি চায়ের টেবিলে এই নূতন ইতিহাস-সৃষ্টিকর্ত্তার পাশে সহজভাবে ;

কেননা আমিও অন্য উপকরণ নিয়ে মানুষের ইতিহাস-সৃষ্টিতে আপন শক্তি উৎসর্গ করেছি। সেই স্বতন্ত্র অথচ যথার্থ সহযোগিতার মূল্য যদি না এই বীর বুঝতে পারতেন তবে তাঁর যুদ্ধবিজয়ী শৌর্য্য আপন মূল্য অনেকখানি হারাত। কর্ণেল লরেন্স বলেছেন আরবের মহৎ লোকদের মধ্যে মহম্মদ ও সালাদিনের নিচেই রাজা ফয়সলের স্থান। এই মহত্ত্বের সরলমূর্ত্তি দেখেছি তাঁর সহজ আতিথ্যে, এবং তাঁকে অভিবাদন করেছি। বর্ত্তমান এসিয়ায় যাঁরা প্রবল শক্তিতে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেছেন তাঁদের দুজনকেই দেখলুম অল্পকালের ব্যবধানে। দুজনেরই মধ্যে স্বভাবের একটি মিল দেখা গেল,—উভয়েই আড়ম্বরহীন স্বচ্ছ সরলতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান।

১১

এখান থেকে বিদায় হয়ে গেলেম এখানকার ছাত্রীদের নিমন্ত্রণ সভায়। সঙ্কীর্ণ সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা গলি। পুরাতন বাড়ি দুইধারে সার বেঁধে উঠেছে, কিন্তু তার ভিতরকার লোকযাত্রা বাইরে থেকে কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। নিমন্ত্রণ গৃহের প্রাঙ্গণে সব মেয়েরা বসেছে। একধারে কয়েকটি মেয়ে আলাদা স্থান নিয়েছেন, তাঁরা কালো কাপড়ে সম্বৃত, কিন্তু মুখ ঢাকা নয়। বাকি সবাই বিলাতী পোষাক পরা, স্তব্ধ শান্ত হয়ে থাকবার চেষ্টামাত্র নেই, হাসি গল্পে সভা মুখরিত। প্রাঙ্গণের সম্মুখপ্রান্তে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মতো। তারি রোয়াকে আমার চৌকি পড়েছে। অনুরোধে প'ড়ে কিছু আমাকে বল্‌তে হোলো। বলা হোলেই কয়েকজন মেয়ে এসে আমাকে ফরমাস করলেন আমার কাব্য আবৃত্তি করতে। আগের দিনে এঁরা আবৃত্তি শুনেছিলেন। নিজের

লেখা কিছু তো মনে পড়ে না। অনেক চেষ্টা ক'রে "খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে" কবিতার প্রথম শ্লোক পড়ে গেলুম, একটা জায়গায় ঠেকে যেতেই অর্থহীন শব্দ দিয়ে ছন্দ পূরণ ক'রে দিলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলায় ভোজনের নিমন্ত্রণ। শিক্ষাবিভাগের লোকেরা আয়োজন করেছেন। নদীর ধারের দিকে প্রকাণ্ড একটা ছাদ, সেখানে আলোকমালার নিচে বসে গেছেন অনেক লোক। আমাদের সেই বৃদ্ধ কবিও আমার কাছেই ছিলেন। আহারের পর আমার অভিনন্দন সারা হোলে আমাকে কিছু বল্‌তে হোলো, কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কী মত এঁরা শুন্‌তে চেয়েছিলেন।

শ্রান্তি ঘনীভূত হয়ে আস্‌ছে। আমার পক্ষে নড়ে চড়ে দেখে শুনে বেড়ানো অসম্ভব হয়ে এল। কথা ছিল সকালে টেসিফোনের (Ctesiphon) ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে যেতে হবে। আমি ছাড়া আমার দলের বাকি সবাই দেখ্‌তে গেলেন। একদা এই সহরের গৌরব ছিল অসামান্য। পার্থিয়ানেরা এর পত্তন করে। পারস্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত এদের রাজত্ব ছিল। রোমকেরা বারবার এদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি পার্থিয়েরা খাঁটি পারসিক ছিল না। তারা তুর্ক ছিল ব'লে অনুমান করা হয়, শিক্ষাদীক্ষা অনেকটা পেয়েছিল গ্রীকদের কাছ থেকে। ২২৮ খৃষ্টাব্দে আর্দ্দাশির পার্থিয়দের জয় ক'রে আবার পারস্যকে পারসিক শাসন ও ধর্ম্মের অধীনে এক ক'রে তোলেন। ইনিই সাসানীয় বংশের প্রথম রাজা। তারপরে বারবার রোমানদের উপদ্রব এবং সবশেষে আরবদের আক্রমণ এই সহরকে অভিভূত করেছিল। জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর ব'লে আরবেরা এখান থেকে সমস্ত মালমস্‌লা সরিয়ে বোগ্‌দাদে রাজধানী স্থাপন করে,—টেসিফোন ধূলোয় গেল মিলিয়ে,বাকি রইল বৃহৎ প্রাসাদের একটুখানি খিলান। এই প্রাসাদ প্রথম খস্রুর আদেশে নির্ম্মিত হয়

সাসানীয় যুগের মহাকায় স্থাপত্য শিল্পের একটি অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তরূপে।

সন্ধ্যাবেলায় রাজার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ। ঐশ্বর্য্য-গৌরব প্রমাণ করবার জন্যে কোথাও লেশমাত্র চেষ্টা নেই। রাজার এই অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যে আমার চিত্তকে সব চেয়ে আকর্ষণ করে। পারিষদবর্গ যাঁরা একত্রে আহার করছিলেন হাস্যালাপে তাঁদের সকলের সঙ্গে এঁর অতি সহজ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও বিশেষ ভোজে আহারের পরিমাণে ও আয়োজনে নির্ব্বোধের মতো যে অতিবাহুল্য করে থাকে রাজার ভোজে তা দেখ্‌লুম না। লম্বা টেবিলের উপর সাদা চাদর পাতা। বিরলভাবে কয়েকটি ফুলের তোড়া আছে, তা ছাড়া সাজসজ্জার চমক নেই একটুও। এতে আতিথ্যের যথার্থ আরাম পাওয়া যায়।

বৌমা রাণীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন,—ভদ্রঘরের গৃহিণীর মতো আড়ম্বরহীন সরল অমায়িক ব্যবহার, নিজেকে রাণী ব'লে প্রমাণ করবার প্রয়াস মাত্র নেই।

আজ একজন বেদুয়িন দলপতির তাঁবুতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমটা ভাবলুম পারব না, শরীরটার প্রতি করুণা ক'রে না যাওয়াই ভালো। তারপরে মনে পড়ল, একদা আস্ফালন ক'রে লিখেছিলুম, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।" তখন বয়স ছিল তিরিশের কাছ ঘেঁষে, সে তিরিশ আজ পিছনের দিগন্তে বিলীনপ্রায়। তা হোক্, কবিতাটাকে কিছু পরিমাণে পরখ ক'রে না এলে মনে পরিতাপ থাকবে। সকালে বেরিয়ে পড়লুম। পথের মধ্যে হঠাৎ নিয়ে গেল ট্রেনিং স্কুলের ছেলেদের মাঝখানে, হঠাৎ তাদের কিছু বল্‌তেও হোলো। পথে পথে কত কথাই ছড়াতে হয়, সে পাকা ফল নয়, সে ঝরাপাতা, কেবলমাত্র ধূলোর দাবী মেটাবার জন্যে।

তারপরে গাড়ি চল্‌ল মরুভূমির মধ্য দিয়ে। বালু মরু নয়, শক্ত মাটি। মাঝে মাঝে নদী থেকে জল এনেছে নালা কেটে তাই এখানে ওখানে কিছু কিছু ফসলের আভাস দেখা দিয়েছে। পথের মধ্যে দেখা গেল নিমন্ত্রণকর্ত্তা আর-এক মোটরে ক'রে চলছেন, তাঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেওয়া হোলো। শক্ত মানুষ, তীক্ষ্ণ চক্ষু; বেদুয়িনী পোষাক।

অর্থাৎ মাথায় একখণ্ড শাদা কাপড় ঘিরে আছে কালো বিড়ের মতো বস্ত্র বেষ্টনী। ভিতরে শাদা লম্বা আঙিয়া, তার উপরে কালো পাৎলা জোব্বা। আমার সঙ্গীরা বললেন যদিও ইনি পড়াশুনো করেন নি বললেই হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ইনি এখানকার পার্লামেণ্টের একজন মেম্বর।

রৌদ্রে ধূ ধূ করছে ধূসর মাটি, দূরে কোথাও কোথাও মরীচিকা দেখা দিল। কোথাও মেষপালক নিয়ে চলেছে ভেড়ার পাল, কোথাও চর্‌ছে উট, কোথাও বা ঘোড়া। হু হু ক'রে বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে ঘুব খেতে খেতে ছুটেছে ধূলির আবর্ত্ত। অনেক দূর পেরিয়ে এঁদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছলুম। একটা বড়ো খোলা তাঁবুর মধ্যে দলের লোক বসে গেছে, কফি সিদ্ধ হচ্চে, খাচ্চে ঢেলে ঢেলে।

আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠাণ্ডা। মেঝেতে কার্পেট, একপ্রান্তে তক্তপোষের উপর গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে কাঠের থাম, তার উপরে ভর দিয়ে লম্বা লম্বা খুঁটির পরে মাটির ছাদ। আত্মীয় বান্ধবেরা সব এদিকে ওদিকে, একটা বড়ো কাঁচের গুড়-গুড়িতে একজন তামাক টানছে। ছোটো আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু ক'রে কফি ঢাল্‌লে, ঘন কফি, কালো তিতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন আহার ইচ্ছা করি কি না,

"না" বল্‌লে আনবার রীতি নয়। ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্ব্বে সুরু হোলো একটু সঙ্গীতের ভূমিকা। গোটাকতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া জড়ানো একটা ত্যাড়া বাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধর্‌লে। তার মধ্যে বৈদুয়িনী তেজ কিছুই ছিল না। অত্যন্ত মিহিচড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান। একটা বড়ো জাতের পতঙ্গের রাগিণী বল্‌লেই হয়। অবশেষে সামনে চিলিম্‌চি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বস্‌লুম। মেঝের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণচন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা রুটি, হাতাওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্ব্বত আর তার উপর মস্ত এবং আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু তিনজন জোয়ান বহন ক'রে মেঝের উপরে রাখ্‌লে। পূর্ব্ববর্ত্তী মিহি করুণ রাগিণীর সঙ্গে এই ভোজের আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। আহারার্থীরা সব বসল থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে ক'রে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয়রূপে। গৃহকর্ত্তা বললেন, আমাদের নিয়ম এই যে অতিথিরা যতক্ষণ আহার করতে থাকে আমরা অভুক্ত দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু সময়াভাবে আজ সে নিয়ম রাখা চল্‌বে না। তাই অদূরে আর একটা প্রকাণ্ড থালা পড়ল। তাতে তাঁরা স্বজনবর্গ বসে গেলেন। যে অতিথিদের সম্মান অপেক্ষাকৃত কম আমাদের ভুক্তা-বশেষ তাঁদের ভাগে পড়ল। এইবার হোলো নাচের ফরমাস। একজন এক ঘেয়ে সুরে বাঁশি বাজিয়ে চল্‌ল, আর এরা তার তাল রাখ্‌লে লাফিয়ে লাফিয়ে। এ'কে নাচ বল্‌লে বেশি বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রধান, হাতে একখানা রুমাল নিয়ে সেইটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগে আগে নাচতে লাগল, তারি কিঞ্চিৎ ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ছিল। ইতিমধ্যে বৌমা গেলেন

এদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েরা তাঁকে নাচ দেখালেন, তিনি বল্লেন সে নাচের মতো নাচ বটে,—বোঝা গেল য়ুরোপীয় নটীরা প্রাচ্য নাচের কায়দায় এদের অনুকরণ করে কিন্তু সম্পূর্ণ রস দিতে পারে না।

তারপরে বাইরে এসে যুদ্ধের নাচ দেখ্‌লুম। লাঠি ছুরি বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে চীৎকার করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তাদের মাতুনি, ওদিকে অন্তঃপুরের দ্বার থেকে মেয়েরা দিচ্চে তাদের উৎসাহ। বেলা চারটে পেরিয়ে গেল, আমরা ফেরবার পথে গাড়িতে উঠ্‌লুম—সঙ্গে চল্‌লেন আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তা।

এরা মরুর সন্তান, কঠিন এই জাত, জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এদের নিত্য ব্যবহার। এরা কারো কাছে প্রশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না কেনন্য পৃথিবী এদের প্রশ্রয় দেয়নি। জীববিজ্ঞানে প্রকৃতি কর্ত্তৃক বাছাইয়ের কথা বলে, জীবনের সমস্যা সুকঠোর করে দিয়ে এদেরই মাঝে যথার্থ কড়া বাছাই হয়ে গেছে, দুর্ব্বলেরা বাদ প'ড়ে যারা নিতান্ত টিকে গেল এরা সেই জাত। মরণ এদের বাজিয়ে নিয়েছে। এদের যে এক একটি দল তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এদের মাতৃভূমির কোলের পরিসর ছোটো, নিত্য বিপদে বেষ্টিত জীবনের স্বল্প দান এরা সকলে মিলে ভাগ ক'রে ভোগ করে। এক বড়ো থালে এদের সকলের অন্ন, তার মধ্যে সৌখীন রুচির স্থান নেই; তারা পরস্পরের মোটা রুটি অংশ করে নিয়েছে, পরস্পরের জন্যে প্রাণ দেবার দাবী এই এক রুটি ভাঙার মধ্যেই। বাংলাদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুয়িন দলপতি যখন বললেন, আমাদের আদিগুরু বলেছেন, যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের কোনো

আশঙ্কা নেই সেই যথার্থ মুসলমান, তখন সে কথা মনকে চমকিয়ে দিলে। তিনি বললেন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চল্‌ছে এ পাপের মূল রয়েছে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে ইসলামের নামে হিংস্র-ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বল্‌লেন আমি তাঁদের সত্যতায় বিশ্বাস করিনে, তাই তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণে যেতে অস্বীকার করেছিলেম; অন্তত আরবদেশে তাঁরা শ্রদ্ধা পাননি। আমি এঁকে বল্‌লেম, একদিন কবিতায় লিখেছি "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন"—আজ আমার হৃদয় বেদুয়িন হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এসেছে, যথার্থই আমি তাদের সঙ্গে এক অন্ন খেয়েছি অন্তরের মধ্যে।

তারপরে যখন আমাদের মোটর চল্‌ল, দুই পাশের মাঠে এদের ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া ছোটাবার খেলা দেখিয়ে দিলে। মনে হোলো মরুভূমির ঘূর্ণা হাওয়ার দল শরীর নিয়েছে।

বোধ হচ্চে আমার ভ্রমণ এই "আরব বেদুয়িনে" এসেই শেষ হোলো। দেশে যাত্রা করবার আর দু'তিন দিন বাকি কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত যে এর মধ্যে আর কোনো দেখা শোনা চল্‌বে না। তাই, এই মরুভূমির বন্ধুত্বের মধ্যে ভ্রমণের উপসংহারটা ভালোই লাগছে। আমার বেদুয়িন নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাকে বল্‌লুম যে, বেদুয়িন আতিথ্যের পরিচয় পেয়েছি কিন্তু বেদুয়িন দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না। তিনি হেসে বল্‌লেন, তার একটু বাধা আছে। আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে না। এই জন্যে মহাজনরা যখন আমাদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে তখন অনেক সময় বিজ্ঞ চেহারার প্রবীণ লোককে উটের 'পরে চড়িয়ে তাদের কর্ত্তা সাজিয়ে আনে। আমি তাঁকে বল্‌লুম, চীনে ভ্রমণ করবার সময়

আমার কোনো চৈনিক বন্ধুকে বলেছিলেম একবার চীনের ডাকাতের হাতে ধরা প'ড়ে আমার চীন-ভ্রমণের বিবরণটাকে জমিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে। তিনি বল্‌লেন চীনের ডাকাতেরা আপনার মতো বৃদ্ধ কবির 'পরে অত্যাচার করবে না, তারা প্রাচীনকে ভক্তি করে। সত্তর বছর বয়সে যৌবনের পরীক্ষা চলবে না। নানাস্থানে ঘোরা শেষ হোলো, বিদেশীর কাছ থেকে কিছু ভক্তি নিয়ে শ্রদ্ধা নিয়েই দেশে ফিরে যাব, তারপরে আশা করি কর্ম্মের অবসানে শান্তির অবকাশ আসবে। যুবকে যুবকে দ্বন্দ্ব ঘটে সেই দ্বন্দ্বের আলোড়নে সংসার প্রবাহের বিকৃতি দূর হয়। দস্যু যখন বৃদ্ধকে ভক্তি করে তখন সে তাকে আপন জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যুবকের সাজেই তার শক্তির পরীক্ষা, সেই দ্বন্দ্বের আঘাতে শক্তি প্রবল থাকে, অতএব ভক্তির সুদূর অন্তরালে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।